মর্দে মু'মিনের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا —অর্থাৎ এমনসব লোকই হল সত্যিকার মু'মিন যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ। অন্যথায় যাদের মধ্যে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ বললেও তাদের অন্তরে না থাকে তওহীদের রং, আর না থাকে রসূলের আনুগত্য। তাদের কার্যধারা তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। কাজেই এ আয়াতে এই ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সত্যেরই একটা তাৎপর্য থাকে, তা যখন অর্জিত হয় না, তখন সত্যটিও লাভ হয় না।

কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (র)-র নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, হে আবু সাঈদ! আপনি কি মু'মিন? তখন তিনি বললেন, ভাই, ঈমান দু'প্রকার। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাব-সমূহ ও রসূলগণের উপর এবং বেহেশত, দোযখ, কিয়ামত ও হিসাব-কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কি না? তাহলে তার উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মু'মিন। পক্ষান্তরে সূরা আনফালের আয়াতে যে মু'মিনে কামিল বা পরিপূর্ণ মু'মিনের কথা বলা হয়েছে তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, আমি তেমন মু'মিন কি না? তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কি না। সূরা আনফালের আয়াত বলতে সে আয়াত-গুলোই উদ্দেশ্য যা আপনারা এইমাত্র শুনলেন।

আয়াতগুলোতে সত্যিকার মু'মিনের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ—لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ —এতে মু'মিনদের জন্য তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। (১) সুউচ্চ মর্যাদা, (২) মাগফিরাত বা ক্ষমা এবং (৩) সম্মানজনক রিযিক।

তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে মু'মিনদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন রকম। (১) সেসব বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন, ঈমান, আল্লাহ্‌ভীতি, আল্লাহর উপর ভরসা বা নির্ভরশীলতা, (২) যার সম্পর্ক দৈহিক কার্যকলাপের সাথে। যেমন, নামায, রোযা প্রভৃতি (৩) যার সম্পর্ক ধন-সম্পদের সাথে। যেমন, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তিনটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। আত্মিক গুণাবলীর জন্য 'সুউচ্চ মর্যাদা'। সেসমস্ত আমল বা কাজ-কর্মের জন্য 'মাগফিরাত'

বা ক্ষমা যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের দেহের সাথে। যেমন নামায, রোযা প্রভৃতি। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, নামাযে পাপসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর 'সম্মানজনক রিযিক'-এর ওয়াদা দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করার জন্য। মু'মিন এ পথে যা ব্যয় করবে, আখিরাতে সে তদপেক্ষা বহু উত্তম ও বেশী প্রাপ্ত হবে।

كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ ۝ يُجَٰدِلُونَكَ فِى ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۝

(৫) যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদিগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। (৬) তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কোন কোন লোকের মনে কষ্টবোধ হলেও গনীমতের মালামাল নিজের ইচ্ছামত বিলি-বন্টন না করে, বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তা বন্টিত হওয়ার বিষয়টি বহুবিধ কল্যাণের কারণে যথেষ্ট মঙ্গলকর। বিষয়টি যদিও প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কিন্তু বহুবিধ বিষয়ে কল্যাণকর হওয়ার দরুন এটি এমনি বিষয়) যেমন আপনার পালনকর্তা আপনাকে নিজের বাড়ী-ঘর (ও জনপদ) থেকে কল্যাণের ভিত্তিতে (বদর প্রান্তরের দিকে) পরিচালিত করেছেন। পক্ষান্তরে মুসলমানদের একটি দল (নিজেদের সংখ্যা ও যুদ্ধের উপকরণ বা সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতার দরুন প্রকৃতিগতভাবে) এ (বিষয়টি)-কে ভারী মনে করছিল। তারা এই শুভকর্মে (অর্থাৎ জিহাদ এবং সৈন্যদের সম্মুখ সমরের ব্যাপারে) তা প্রকাশিত হয়ে যাবার পরেও (আত্মরক্ষার জন্য পরামর্শচ্ছলে) আপনার সাথে এমনভাবে বিবাদ করছিল যেন তাদেরকে কেউ মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তারা (যেন মৃত্যুকে) প্রত্যক্ষ করছে। (কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ফলাফলও শুভই হয়েছে। ইসলামের বিজয় এবং কুফরের পরাজয় সূচিত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূরা আনফালের অধিকাংশ বিষয়ই হলো কাফির-মুশরিকদের আযাব ও প্রতিশোধ এবং মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ ও পুরস্কার সম্পর্কিত। এতে উভয় পক্ষের জন্যই শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয় এবং বিধি-বিধান

বর্ণিত হয়েছে। আর এসব বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল বদর যুদ্ধ। এতে বিপুল আয়োজন, সংখ্যাধিক্য ও প্রচুর শক্তি সত্ত্বেও মুশরেকীনরা জান-মালের বিপুল ক্ষতিসহ পরাজয় বরণ করেছে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা সর্বপ্রকার স্বল্পতা এবং নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও বিজয়ের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এ সূরায় রয়েছে বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ। আলোচ্য আয়াত থেকেই তার আরম্ভ।

প্রথম আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধের সময় কোন কোন মুসলমান জিহাদের অভিযান পছন্দ করেন নি; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিশেষ ফরমানের সাহায্যে রসূল করীম (সা)-কে জিহাদাভিযানের নির্দেশ দিলে তাঁরাও তাতে অংশগ্রহণ করেন, যাঁরা ইতিপূর্বে বিষয়টিকে পছন্দ করেছিলেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআন করীম এমন সব শব্দ প্রয়োগ করেছে, যেগুলো বিভিন্নভাবে প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমত এই যে, আয়াতটি আরম্ভ করা হয়েছে كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ বাক্য দিয়ে। এতে كَمَا এমন একটি বাক্যাংশ, যা তুলনা বা উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রয়োগ করা হয়। অতএব, লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে কিসের সাথে কিসের তুলনা করা হচ্ছে। তফসীরকার মনীষীবৃন্দ এর বিভিন্ন বিশ্লেষণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হাইয়্যান (র) এ ধরনের পনেরটি বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনটি সম্ভাবনা প্রবল।

এক---এই তুলনার উদ্দেশ্য এই যে, যেভাবে বদর যুদ্ধে হস্তগত গনীমতের মালামাল বন্টন করার সময় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মাঝে পারস্পরিক কিছুটা মতবিরোধ হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক সবাই মহানবী (সা)-র হুকুমের প্রতি আনুগত্য করেন এবং তাঁর বরকত ও শুভ পরিণতিসমূহ দেখতে পান, তেমনিভাবে এ জিহাদের প্রারম্ভে কারো কারো পক্ষ থেকে তা অপছন্দ করা হলেও পরে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তার শুভফল ও উত্তম পরিণতি দেখতে পায়। এ বিশ্লেষণকে ফার্‌রা ও মুবার্‌রাদ-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বয়ানুল-কোরআনেও এ বিশ্লেষণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

দুই---দ্বিতীয়ত এমন সম্ভাবনাও হতে পারে যে, বিগত আয়াতসমূহে সত্যিকার মু'মিনদের জন্য আখিরাতে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অতপর এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত প্রতিশ্রুতির অবশ্যম্ভাবিতা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আখিরাতের প্রতিশ্রুতি যদিও এখনই চোখে পড়ে না, কিন্তু বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস কর যে, এ পৃথিবীতেই যেভাবে ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে, তেমনিভাবে আখিরাতের ওয়াদাও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। ---(কুরতুবী)

তিন—তৃতীয়ত এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যা আবূ-হাইয়্যান (র) মুফাস্‌সেরীন-দের পনেরটি উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এ সমস্ত উক্তির কোনটির উপরেই আমার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল না। একদিন আমি এ আয়াতটির বিষয় চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেখলাম, আমি কোথাও যাচ্ছি এবং আমার সাথে অন্য একটি লোক রয়েছে। আমি সে লোকটির সাথে এ আয়াতের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে বললাম, আমি কখনও এমন জটিলতার সম্মুখীন হইনি, যেমনটি এ আয়াতের ব্যাপারে হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, যেন এখানে কোন একটি শব্দ উহ্য রয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ স্বপ্নের মাঝেই আমার মনে পড়ে গেল যে, এখানে نَصَرَكَ (নাসারাকা) শব্দটি উহ্য রয়েছে। বিষয়টি আমারও বেশ মনঃপুত ও পছন্দ হল এবং যার সাথে তর্ক করছিলাম সেও পছন্দ করলো। ঘুম থেকে জাগার পর পুনরায় বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। তাতে আমার মনের সন্দেহ বা প্রশ্ন দূর হয়ে গেল। কারণ, এ ক্ষেত্রে كما শব্দটির ব্যবহার উদাহরণ ব্যক্ত করার জন্য থাকে না, বরং কারণ বিশ্লেষণাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। আর তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বদর যুদ্ধের সময় মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে বিশেষ সাহায্য-সহায়তা নবী করীম (সা)-এর প্রতি হয়েছিল, তার কারণ ছিল এই যে, এই জিহাদে তিনি যা কিছু করে-ছিলেন, তার কোন কিছুই নিজের মতে করেন নি, বরং সেসবই করেছিলেন প্রভুর নির্দেশে এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রেক্ষিতে। তাঁরই হুকুমে তিনি নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে-ছিলেন। আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ফলও তাই হওয়া উচিত এবং তাতেই আল্লাহ্‌র সাহায্য-সহায়তা পাওয়া যায়।

যা হোক, আয়াতে বর্ণিত এই বাক্যটিতে উল্লিখিত তিনটি অর্থেরই সম্ভাবনা রয়েছে এবং তিনটিই যথার্থও বটে। অতপর লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নিজেই তাঁকে বের করেছেন। এতে রসূলে করীম (সা)-এর আনুগত্যের পরিপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর প্রতিটি কাজ-কর্ম প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ, যা তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যেমন, এক হাদীসে-কুদ্‌সীতে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, 'মানুষ যখন আনুগত্য ও সেবার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারে বলেন যে, আমি তার চোখ হয়ে যাই; সে যা কিছু অবলোকন করে, আমারই মাধ্যমে অবলোকন করে। আমি তার কান হয়ে যাই; সে যা কিছু শোনে আমারই মাধ্যমে শোনে। আমি তার হাত-পা হয়ে যাই; সে যা কিছু ধরে, আমারই মাধ্যমে ধরে, যে দিকে যায় আমারই মাধ্যমে যায়। সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সাহায্য সহায়তা তখন তার নিত্যসঙ্গী হয়ে যায়। বাহ্যত তার চোখ-কান ও হাত-পা দ্বারা যেসব কাজ সম্পাদিত হয়, তাতে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'অলার ক্ষমতা ও কর্মক্ষমতাই সক্রিয় থাকে।

رشتۂ در گردنم افگندہ دوست
میبرد ہرجاکہ خاطر خواہ دوست

বস্তুত أَخْرَجَكَ বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জিহাদের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা)-র যাত্রা প্রকৃত প্রস্তাবে যেন আল্লাহ্ তা'আলারই যাত্রা ছিল, যা হুযুরের মাধ্যমে বাস্তবতা লাভ করেছে বা প্রকাশ পেয়েছে।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এখানে أَخْرَجَكَ رَبُّكَ বলা হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র উল্লেখ এসেছে 'রব' গুণবাচক নামে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর এ জিহাদ যাত্রা ছিল পালনকর্তা ও লালনসুলভ গুণেরই দাবি। কারণ, এতে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত মুসলমানদের জন্য বিজয় এবং অত্যাচারী, দাম্ভিক কাফিরদের জন্য আযাবের বিকাশই ছিল উদ্দেশ্য।

مِنْ بَيْتِكَ-এর অর্থ হল আপনার ঘর থেকে। অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনার ঘর থেকে বের করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই 'ঘর' বলতে মদীনা তাইয়্যেবার ঘর কিংবা মদীনাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে হিজরতের পর তিনি অবস্থান করছিলেন। কারণ, বদরের ঘটনাটি হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। এই সঙ্গে بِالْحَقِّ শব্দ ব্যবহার করে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় বিষয়টিই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র বা সরকারের মত রাজ্য বিস্তারের লোভ কিংবা রাজন্যবর্গের রাগ-রোষের প্রেক্ষিতে ছিল না। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ অর্থাৎ মুসলমানদের কোন একটি দল এ জিহাদ কঠিন মনে করছিল এবং পছন্দ করছিল না। সাহাবায়ে কিরামের মনে এই কঠিনতাবোধ কেমন করে এল, সেকথা উপলব্ধি করার জন্য এবং পরবর্তী অন্যান্য আয়াত যথাযথভাবে বোঝার জন্য প্রথম গয্ওয়ায়ে বদরের প্রাথমিক অবস্থা ও কারণগুলো জেনে নেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং প্রথমে বদর যুদ্ধের পূর্ণ ঘটনাটি লক্ষ্য করুন।

ইবনে-আকাবাহ্ ও ইবনে আমরের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি ছিল এই যে, রসূলে করীম (সা)-এর নিকট মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌঁছে যে, আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাফিলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কুরাইশ অংশীদার। ইবনে-আকাবার বর্ণনা অনুযায়ী

মক্কায় এমন কোন কুরাইশ নারী বা পুরুষ ছিল না, যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। কারো কাছে এক মিস্‌কাল (সাড়ে চার মাশা) পরিমাণ সোনা থাকলে সেও তা এতে নিজের অংশ হিসাবে লাগিয়েছিল। এই কাফেলার মোট পুঁজি সম্পর্কে ইবনে আকাবার বর্ণনা হচ্ছে এই যে, তা পঞ্চাশ হাজার দীনার ছিল। দীনার হল একটি স্বর্ণমুদ্রা যার ওজন সাড়ে চার মাশা। স্বর্ণের বর্তমান দর অনুযায়ী এর মূল্য হয় বায়ান্ন টাকা এবং গোটা পুঁজির মূল্য হয় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। আর তাও আজকের নয়, বরং চৌদ্দ'শ বছর পূর্বেকার ছাব্বিশ লক্ষ যা বর্তমানে ছাব্বিশ কোটি অপেক্ষাও অনেক গুণ বেশি হতে পারে। এই বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসায়ের জন্য সত্তর জন কুরাইশ যুবক ও সর্দার এর সাথে ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য কাফেলাটি ছিল কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কোম্পানী।

ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখের রিওয়ায়েত মতে বগভী (র) উল্লেখ করেছেন যে, এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কুরাইশদের চাল্লিশ জন ঘোড়সওয়ার সর্দার, যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস মাখরামাহ ইবনে নাওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানত যে, কুরাইশদের এই বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক এই পুঁজিই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রসূলে করীম (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই হুযূর (সা) যখন সিরিয়া থেকে এই কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মুকাবিলা করে কুরাইশদের ক্ষমতাকে ভেঙে দেওয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহাবায়ে-কিরামদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমযানের মাস। যুদ্ধেরও কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুটা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং হুযূর (সা)-ও সবার উপর এ জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে অপরিহার্য বা বাধ্যতামূলক হিসাবে সাব্যস্ত করলেন না; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাঁদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাঁরা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যাঁরা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়, তাঁরা গ্রাম থেকে সওয়ারী আনিয়ে পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মত সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হল, যাঁদের কাছে এ মুহূর্তে সওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জিহাদে যেতে চান, শুধু তাঁরাই যাবেন; বাইরে থেকে সওয়ারী আনিয়ে নেবার মত সময় এখন নেই। কাজেই হুযূর (সা)-এর সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরি হতে পারলেন। বস্তুত যাঁরা এই জিহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি, তার কারণও ছিল। তা এই যে, মহানবী (সা) এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেন নি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোন যুদ্ধবাহিনী নয় যার মুকাবিলা করার জন্য রসূলে করীম (সা) এবং তাঁর সঙ্গীদের খুব বেশি পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহিদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে-কিরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেন নি।

মহানবী (সা) 'বি'রে সুক্‌ইয়া' নামক স্থানে পেঁৗছে যখন কায়েস ইবনে সা'সা'আ (রা)-কে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণে নিয়ে জানান তিন'শ তের জন রয়েছে। মহানবী (সা) এ কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ তালুতের সৈন্য সংখ্যাও এই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কিরামের সাথে মোট উট ছিল সত্তরটি। প্রতি তিনজনের জন্য একটি, যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ারী করেছিলেন। স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-এর সাথে অপর দু'জন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হযরত আবূ লুবাবাহ ও হযরত আলী (রা)। যখন হুযূর (সা)-এর পায়ে হেঁটে চলার পালা আসতো তখন তারা (ইয়া রসূলাল্লাহ্) আপনি উটের উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলব। তাতে রাহ্‌মাতুল্‌লিল আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসত ঃ না, তোমরা আমার চাইতে বেশি বলিষ্ঠ, আর না আখিরাতের সওয়াবে আমার প্রয়োজন নেই ; যে আমার সওয়াবের সুযোগটি তোমাদের দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে মহানবী (সা)-ও পায়ে হেঁটে চলতেন।

অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান 'আইনে-যোর্‌কায়' পৌঁছে কোন এক লোক কুরাইশ কাফেলার নেতা আবূ সুফিয়ানকে এ সংবাদ জানিয়ে দিল যে রসূলে করীম (সা) তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করেছেন, তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবূ সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি হেজাযের সীমানায় গিয়ে পৌঁছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জনৈক দম্ দম্ ইবনে উমরকে (ضمضم ابن عمر) কুড়ি মিসকাল সোনা অর্থাৎ প্রায় দু'হাজার টাকা মজুরী দিয়ে এ ব্যাপারে রাযী করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্র মক্কা মুকাররমায় গিয়ে এ সংবাদটি পেঁৗছে দেবে যে, তাদের কাফেলা সাহাবায়ে-কিরামের আক্রমণ আশংকার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

দম্‌দম্ ইবনে ওমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশংকার ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক-কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোশাকের সামনের ও পিছনের অংশ ছিঁড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিল। এটি ছিল সেকালে ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকল, তখন গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈ-চৈ পড়ে গেল, সাজ সাজ রব উঠল। সমস্ত কুরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়ে পড়ল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোন কারণে অপারক ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত, তাদেরকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলমানদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরনের লোককে তারা বিশেষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ছিলেন এবং কোন অসুবিধার দরুন তখনও হিজরত করতে না পেরে মক্কাতে

অবস্থান করছিলেন, তাঁদেরকে এবং বনূ হাশিম গোত্রের যেসব লোকের প্রতি এমন ধারণা হতো যে, এরা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে, তাঁদেরকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে মহানবী (সা)-র পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা) এবং আবূ তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকীলও ছিলেন।

যা হোক, এভাবে সব মিলিয়ে এই বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান, দু'শ ঘোড়া ছ'শ বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাঁদীদল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদি সহ বদর অভিমুখে রওনা হল। প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের খাবার জন্য দশটি করে উট জবাই করা হত।

অপরদিকে রসূলে করীম (সা) শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মুকাবিলা করার অনুপাতে প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমযান শনিবার মদীনা তাইয়্যেবা থেকে রওনা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর বদরের নিকট এসে পৌঁছে দু'জন সাহাবীকে আবূ সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন।—(মাযহারী)

সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবূ সুফিয়ানের কাফিলা মহানবীর পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কুরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। —(ইবনে কাসীর)

বলা বাহুল্য, এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল। তখন রসূলে করীম (সা) সঙ্গী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কি না। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মুকাবিলা করার মত শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসিওনি। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং রসূলের নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারূকে আযম (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জিহাদের জন্য প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতপর মেকদাদ (রা) উঠে নিবেদন করলেন ঃ

'ইয়া রসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী ইসরাঈলরা দিয়েছিল হযরত মূসা (আ)-কে। তারা বলেছিল ঃ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ অর্থাৎ যান, আপনি ও আপনার রব (পালনকর্তাই) গিয়ে লড়াই করুন, আমরা তো এখানেই বসে থাকলাম। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার 'বারকুল গিমাদ' নামক স্থান পর্যন্ত নিয়ে যান, তবুও আমরা জিহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব।"

মহানবী (সা) হযরত মেকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনও আনসারদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল

না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, হুযূরে আকরাম (সা)-এর সাথে আনসারদের যে সহযোগিতা-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যেহেতু তা ছিল মদীনার অভ্যন্তরের জন্য, সেহেতু তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং মহানবী (সা) সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমরা এই জিহাদে মদীনার বাইরে এগিয়ে যাব কিনা? এই সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসাররা। হযরত সা'দ ইবনে মু'আয আনসারী (রা) হুযূর (সা)-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনি কি আমাদের জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সা'দ ইবনে মু'আয (রা) বললেন ঃ

"ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি যে, যে কোন অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতএব, আপনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে দীনে-হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্য থেকে কোন একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদের শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্র নামে আমাদের যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।"

এ বক্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত খুশি হলেন এবং স্বীয় কাফেলাকে হুকুম করলেন, আল্লাহ্র নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দু'টি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। দু'টি দল বলতে, একটি হল আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফিলা, আর অপরটি হল মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতপর তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি।

(---এ সমুদয় ঘটনা তফসীরে ইবনে কাসীর এবং মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।)

ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে জানার পর আলোচ্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথম আয়াতে-وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ মুসলমানদের একটি দল এই জিহাদকে কঠিন মনে করছিল বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাতে পরামর্শকালে সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে জিহাদের ব্যাপারে যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর এ ঘটনারই বিশ্লেষণ ব্যক্ত হয়েছে পরবর্তী يُجَادِلُونَكَ فِي

الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ

আয়াতে। অর্থাৎ এরা আপনার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক ও বিরোধ করেছে যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে।

সাহাবায়ে কিরাম যদিও কোন রকম নির্দেশ লংঘন করেননি; বরং পরামর্শের উত্তরে নিজেদের দুর্বলতা ও ভীরুতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু রসূলের সহচরদের কাছ থেকে এহেন মত প্রকাশও তাদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র পছন্দ ছিল না। কাজেই অসন্তোষের ভাষায়ই তা বিবৃত করা হয়েছে।

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ
أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ
يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ
الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ
لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝ وَمَا
جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا
مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

(৭) আর যখন আল্লাহ্‌ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কণ্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ্‌ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফিরদের মূল কর্তন করে দিতে, (৮) যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়। (৯) তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। (১০) আর আল্লাহ্‌ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে।

আর সাহায্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাশক্তির অধিকারী, হিকমতওয়ালা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তোমরা স্মরণ কর সে সময়টির কথা, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সে দু'টি দল (অর্থাৎ বাণিজ্যিক কাফেলা ও কুরাইশ বাহিনী)-এর মধ্য থেকে একটি (দল) সম্পর্কে ওয়াদা করছিলেন যে, তা (অর্থাৎ সে দল) তোমাদের হস্তগত হবে। [অর্থাৎ পরাজিত হয়ে পড়বে। মুসলমানদের সাথে এ ওয়াদাটি করা হয়েছিল, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমে ওহীযোগে। আর তোমরা কামনা করছিলে নিরস্ত্র দলটি (অর্থাৎ বাণিজ্যিক কাফেলাটি) যেন তোমাদের হস্তগত হয়। অথচ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল স্বীয় আহকামের দ্বারা সত্যকে (কার্যকরভাবে বিজয় দান করে) সত্য হিসাবে প্রমাণ করে দেয়া এবং (তাঁর ইচ্ছা ছিল সে সমস্ত) কাফিরদের মূল কেটে দিয়ে সত্যের সত্যতা ও মিথ্যার অসারতা (বাস্তব ক্ষেত্রে) প্রমাণ করে দেয়া। তা এই অপরাধীরা (অর্থাৎ পরাজিত কাফিররা একে যতই) অপছন্দ করুক না কেন। সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারের কাছে (নিজেদের সংখ্যা ও যুদ্ধের সাজসর-ঞ্জামের স্বল্পতা এবং শত্রুদের আধিক্য দেখে ফরিয়াদ) করছিলে তখন আল্লাহ্ তোমা-দের ফরিয়াদে সাড়া দিলেন (এবং ওয়াদা করলেন) যে তোমাদিগকে এক হাজার ফেরেশ-তার দ্বারা সাহায্য করবেন, যা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা এই সাহায্য করেছিলেন শুধুমাত্র এই হিকমতের ভিত্তিতে, যাতে তোমরা (বিজয় লাভের) সুসংবাদ পেতে পার এবং যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হয় (অর্থাৎ যেহেতু মানুষের মানসিক স্বস্তি উপকরণ এবং সাজ-সরঞ্জামের মাধ্যমেই হতে পারে সেজন্য তাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।) ' বস্তুত (প্রকৃতপক্ষে কৃতকার্যতা ও বিজয় শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে যিনি পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে গয্ওয়ায়ে বদরের ঘটনা এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে সাহায্য ও বিশেষ অনুগ্রহ মুসলমানদের প্রতি হয়েছিল, তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন এই সংবাদ জানতে পারেন যে, কুরাইশদের এক বিরাট বাহিনী তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে, তখন মুসলমানদের সামনে ছিল দু'টি দল। একটি হল বাণিজ্যিক কাফেলা যাকে হাদীসে عير (ঈর) বলা হয়েছে এবং অপরটি ছিল সুসজ্জিত সেনাদল যাকে نفير (নাফীর) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রসূল (সা) এবং

তাঁর সাথে যুক্ত সমস্ত মুসলমানের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, এ দু'টি দলের কোন একটির উপর তোমাদের পরিপূর্ণ দখল লাভ হবে। ফলে তাদের ব্যাপারে যা খুশী তা করতে পারবে।

বলা বাহুল্য যে, বাণিজ্যিক কাফেলাটি হস্তগত করা ছিল সহজ ও ভয়হীন। আর সশস্ত্র বাহিনী হস্তগত করা ছিল কঠিন ও আশংকাপূর্ণ। কাজেই এহেন অস্পষ্ট ওয়াদার কথা শুনে অনেক সাহাবার কাম্য হয় যে, দলটির উপর মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে সেটি যেন নিরস্ত্র বাণিজ্যিক দলই হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে রসূলে করীম (সা) ও অন্যান্য বড় বড় সাহাবীর বাসনা ছিল যে সশস্ত্র দলটির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেই উত্তম হবে।

এ আয়াতে নিরস্ত্র দলের উপর বিজয় বা অধিকার প্রত্যাশী মুসলমানদের অবহিত করা হয়েছে যে, তোমরা তো নিজেদের আরামপ্রিয়তা ও আশংকামুক্ততার প্রেক্ষিতে নিরস্ত্র দলের উপর অধিকার লাভ করাই পছন্দ করছ, কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হল ইসলামের আসল উদ্দেশ্য অর্জন। অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের যথার্থতা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং কাফিরদের মূল কর্তন। বলা বাহুল্য এটা তখনই হতে পারত, যখন সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মুকাবিলা এবং তাদের উপর মুসলমানদের বিজয় ও পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা হতো।

এর সারমর্ম হল মুসলমানদের এ বিষয়ে জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা যে দিকটি পছন্দ করছ তা একান্ত কাপুরুষতা, আরামপ্রিয়তা ও সাময়িক লাভের বিষয়। অতপর দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়টিকে আরো কিছুটা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার খোদায়ী ক্ষমতার আওতা থেকে কোন কিছু মুক্ত ছিল না; তিনি ইচ্ছা করলে বাণিজ্যিক কাফেলার উপরেও মুসলমানদের বিজয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করে বিজয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করাকেই রসূলে করীম (সা) এবং সাহাবায়ে কিরামের উচ্চ মর্যাদার উপযোগী বিবেচনা করেছেন, যাতে সত্যের ন্যায়সঙ্গতা ও মিথ্যার অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো মহাজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত এবং সর্ব কর্মের আদ্যোপান্ত সম্পর্কে অবগত। কাজেই তাঁর পক্ষ থেকে এহেন অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির মাঝে এমন কি কল্যাণ নিহিত ছিল যে, দুটি দলের যে কোন একটির উপর মুসলমানদের বিজয় ও অধিকার লাভ হবে? তিনি তো যে কোন একটির ব্যাপারে নির্দিষ্ট করেও বলতে পারতেন যে, অমুক দলের উপর অধিকার লাভ হয়ে যাবে?

এই অস্পষ্টতার কারণ আল্লাহ্ই জানেন। তবে মনে হয়--এতে সাহাবায়ে কিরামকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা সহজ কাজটিকে পছন্দ করেন, নাকি কঠিন কাজকে। তাছাড়া এতে তাঁদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতারও অনুশীলন ছিল। এভাবে তাঁদেরকে সৎসাহস ও উচ্চতর উদ্দেশ্য হাসিলের প্রচেষ্টায় কোন রকম ভয় বা আশংকা না করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে রয়েছে সেই ঘটনার বিবরণ, যা সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমর সাব্যস্ত হয়ে যাবার পর ঘটেছিল। রসূলে করীম (সা) যখন লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর সঙ্গী মাত্র তিনশ তের জন, তাও আবার অধিকাংশই নিরস্ত্র, অথচ তাদের মুকাবিলায় রয়েছে এক হাজার জওয়ানের সশস্ত্র বাহিনী, তখন তিনি আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর দরবারে সাহায্য ও সহায়তার জন্য প্রার্থনার হাত ওঠালেন। তিনি দোয়া করছিলেন আর সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলে যাচ্ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-আব্বাস (রা) মহানবী (সা)-র প্রার্থনার নিম্নলিখিত বাক্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন।

'ইয়া আল্লাহ্, আমার সাথে যে ওয়াদা আপনি করেছেন, তা যথাশীঘ্র পূরণ করুন। ইয়া আল্লাহ্, মুসলমানদের এই সামান্য দলটি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার মত কেউ থাকবে না (কারণ, গোটা বিশ্ব কুফরী ও শিরকীতে ভরে গেছে। এই কয়েকজন মুসলমানই আছে যারা ইবাদত-বন্দেগী সম্পাদন করে থাকে)।

মহানবী (সা) অনর্গল এমনিভাবে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দোয়ায় তন্ময় হয়ে থাকেন। এমনকি তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায়। হযরত আবূ বকর (রা) এগিয়ে গিয়ে সে চাদর তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেন এবং নিবেদন করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনি বিশেষ চিন্তা করবেন না, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই আপনার দোয়া কবুল করবেন এবং যে ওয়াদা তিনি করেছেন, তা অবশ্যই পূরণ করবেন।

আয়াতে إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ বাক্যের দ্বারা এ ঘটনাই উদ্দেশ্য। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, সেই সময়ের কথা মনে রাখার মত, যখন আপনি স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট প্রার্থনা করছিলেন এবং তাঁর সাহায্য কামনা করছিলেন। এই প্রার্থনাটি যদিও রসূলে করীম (সা)-এর পক্ষ থেকেই করা হয়েছিল, কিন্তু সাহাবায়ে কিরামও যেহেতু তাঁর সাথে 'আমীন আমীন' বলছিলেন, তাই সমগ্র দলের সাথেই একে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

অতপর এ প্রার্থনা মঞ্জুরীর বিষয়টি এমনভাবে বিবৃত হয়েছে : فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ফরিয়াদ গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করব, যারা একের পর এক করে কাতারবন্দী অবস্থায় আসবে।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ফেরেশতাগণকে যে অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য দান করেছেন তার কিছুটা অনুমান করা যায় সেই ঘটনার দ্বারা, যা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের জনপদকে উল্টে দেয়ার সময় ঘটেছিল। জিবরাঈল (আ) একটি মাত্র পাখার (ঝাপ্টার) মাধ্যমে তা উল্টে দিয়েছিলেন। কাজেই এহেন অনন্যসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতাদের এত

বিপুল সংখ্যককে এ মুকাবিলার জন্য পাঠানোর কোনই প্রয়োজন ছিল না; একজনই যথেষ্ট হতে পারত। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থই অবগত--- তারা যে সংখ্যার দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই প্রতিপক্ষের সংখ্যানুপাতেই সমসংখ্যক ফেরেশতা পাঠানোর ওয়াদা করেছেন, যাতে তাঁদের মন পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত হয়ে যায়।

চতুর্থ আয়াতেও একই বিষয় আলোচিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র এ জন্য করেছেন, যাতে তোমরা সুসংবাদ প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমাদের অন্তর আশ্বস্ত হয়ে যায়।

গয্‌ওয়ায়ে বদরের সময় আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যেসমস্ত ফেরেশতা সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল, এখানে তাদের সংখ্যা এক হাজার ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সূরা আলে-ইমরানে তিন হাজার এবং পাঁচ হাজারেরও উল্লেখ রয়েছে। এর কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনটি ওয়াদার বিভিন্নতা, যা বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। প্রথম ওয়াদাটি ছিল এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণের, যার কারণ ছিল মহানবী (সা)-র দোয়া এবং সাধারণ মুসলমানদের ফরিয়াদ। দ্বিতীয় ওয়াদা, যা তিন হাজার ফেরেশতার ব্যাপারে করা হয় এবং যা ইতিপূর্বে সূরা আলে-ইমরানে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা সেই সময় করা হয়েছিল, যখন মুসলমানদের কাছে এই সংবাদ এসে পৌঁছে যে, কুরাইশ বাহিনীর জন্য আরও বর্ধিত সাহায্য আসছে। রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে মুনযির কর্তৃক শা'বীর উদ্ধৃতিক্রমে উল্লেখ রয়েছে যে, বদরের দিনে মুসলমানদের কাছে এই সংবাদ এসে পৌঁছে যে, কুর্য ইবনে জাবের মুহারেবী মুশরিকীনদের সহায়তার উদ্দেশ্যে আরো সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসছে। এ সংবাদে মুসলমানদের মাঝে এক ত্রাসের সৃষ্টি হয়ে যায়। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আলে-ইমরানের আয়াত الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلثة الاف من الملئكة منزلين অবতীর্ণ হয়। এতে তিন হাজার ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্যকল্পে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করার ওয়াদা করা হয়।

আর তৃতীয় ওয়াদা ছিল পাঁচ হাজারের। তা ছিল এই শর্তযুক্ত যে, বিপক্ষ দল যদি প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসে, তবে পাঁচ হাজার ফেরেশতার সাহায্য পাঠানো হবে। আর তা আলে-ইমরানে উল্লিখিত আয়াতের পরবর্তী আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে:

بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملئكة مسومين অর্থাৎ যদি তোমরা দৃঢ়তা

অবলম্বন কর, তাকওয়ার উপর স্থির থাক এবং যদি প্রতিপক্ষীয় বাহিনী তোমাদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে তোমাদের পরওয়ারদিগার তোমাদের সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে, যাঁরা বিশেষ চিহ্নে অর্থাৎ উর্দিতে সজ্জিত থাকবে।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এ ওয়াদার শর্ত ছিল তিনটি। (এক) দৃঢ়তা অবলম্বন, (দুই) তাকওয়ার উপর স্থির থাকা এবং (তিন) প্রতিপক্ষের ব্যাপক আক্রমণ। প্রথম দু'টি শর্ত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এমনিতেই বিদ্যমান ছিল এবং তাঁদের এই আশায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এতটুকু পার্থক্য আসেনি। কিন্তু তৃতীয় শর্তটি অর্থাৎ ব্যাপক আক্রমণের ব্যাপারটি সংঘটিত হয়নি। কাজেই পাঁচ হাজার ফেরেশতা আগমনের প্রয়োজন হয়নি।

আর সে জন্যই বিষয়টি এক হাজার ও তিন হাজারের মাঝেই সীমিত থাকে। এতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। (এক) তিন হাজার বলতে উদ্দেশ্য হল প্রথমে প্রেরিত এক হাজারের সঙ্গে অতিরিক্ত দু'হাজারকে অন্তর্ভুক্ত করে তিন হাজারে বর্ধিত করে দেওয়া, কিংবা (দুই) প্রথমোক্ত এক হাজারের বাইরে তিন হাজার পাঠানো।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, উক্ত তিনটি আয়াতে ফেরেশতাদের তিনটি দল প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটি দলের সাথেই একেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। সূরা আনফালের যে আয়াতে এক হাজারের ওয়াদা করা হয়েছে, তাতে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে مُرْدِفِيْنَ শব্দ বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো পেছনে লাগোয়া। হয়তো এতে এই ইঙ্গিত করা হয়ে থাকবে যে, এদের পেছনে আরও ফেরেশতা আসবে। পক্ষান্তরে সূরা আলে-ইমরানের প্রথম আয়াতে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য مُنْزَلِيْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ সমস্ত ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতারণ করা হবে। এতে একটি গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্ব থেকে যেসব ফেরেশতা পৃথিবীতে অবস্থান করছেন, তাদেরকে এ কাজে নিয়োগ করার পরিবর্তে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এ কাজের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতারণ করা হবে। বস্তুত সূরা আলে ইমরানের দ্বিতীয় আয়াতে যেখানে পাঁচ হাজারের কথা উল্লেখ রয়েছে, তাতে ফেরেশতাদের مُسَوِّمِيْنَ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা হবেন বিশেষ চিহ্ন এবং বিশেষ পোশাকে ভূষিত। হাদীসের বর্ণনায় তাই রয়েছে যে, বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ ফেরেশতাদের পাগড়ী ছিল সাদা, আর হুনাইনের যুদ্ধে সাহায্যের জন্য আগত ফেরেশতাদের পাগড়ী ছিল লাল।

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে — وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ

إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ । এতে মুসলমানদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনখান থেকে যে সাহায্যই আসুক না কেন, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপন, সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। তাঁরই আয়ত্তে রয়েছে ফেরেশতাদের সাহায্যও। সবই তাঁর আজ্ঞাবহ। অতএব, তোমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র সেই ওয়াহ্দাহু লা-শরীক সত্তার প্রতিই নিবদ্ধ থাকা কর্তব্য। কারণ, তিনি বড়ই ক্ষমতাশীল, হিকমতওয়ালা ও সুকৌশলী।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ
مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ
عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ⑪ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى
الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ
الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا
مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ⑫ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن
يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑬ ذَٰلِكُمْ
فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ⑭

(১১) যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদের পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তর-সমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পা'গুলো। (১২) যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদের তোমাদের পরওয়ারদিগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। (১৩) যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুত যে লোক আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। আপাতত বর্তমান এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখ যে, কাফিরদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর তন্দ্রা আরোপ করেছিলেন নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তি দানের উদ্দেশ্যে এবং যখন তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছিলেন, যেন সেই পানির দ্বারা তোমাদেরকে (অযু-গোসলহীন অবস্থা থেকে) পাক (পবিত্র) করে দেন এবং (তদ্দ্বারা যেন) তোমাদের মন থেকে শয়তানী কুমন্ত্রণাকে দূর করে দেন। আর (তাতে যেন) তোমাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করে দেন এবং (যেন) তোমাদের অবস্থানকে মজবুত করে দেন (অর্থাৎ তোমরা যেন বালুতে ধ্বসে না যাও)। সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার রব (সেই) ফেরেশতাদের (যারা সাহায্যের জন্য অবতরণ করেছিল) নির্দেশ দিচ্ছিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদের সৎসাহস বৃদ্ধি কর। আমি সহসাই কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিচ্ছি। তোমরা কাফিরদের গর্দানের উপর (অস্ত্রের) আঘাত হান এবং তাদের জোড়ায় জোড়ায় হত্যা কর। এটা তারই শাস্তি যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। বস্তুত যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহ্ (তাকে) কঠিন শাস্তি দান করেন (তা দুনিয়াতে কোন বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে কিংবা আখিরাতে সরাসরি অথবা উভয় লোকে)। অতএব (কার্যত বর্তমানে) এই শাস্তিটি আস্বাদন কর এবং জেনে রাখ যে, কাফিরদের জন্য জাহান্নামের আযাব তো নির্ধারিত রয়েছেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আনফালের শুরু থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার সে সমস্ত নিয়ামতের আলোচনা চলছে যা তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে। গযওয়ায়ে-বদরের ঘটনাগুলোও সে ধারারই কয়েকটি বিষয়। গযওয়ায়ে-বদরে যেসব নিয়ামত আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে দান করা হয়েছে তার প্রথমটি ছিল এ যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যাত্রা করা যা وَإِذْ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ আয়াতে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় নিয়ামত হল ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ওয়াদা, যা إِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। আর তৃতীয় নিয়ামত দোয়ার মঞ্জুরী ও সাহায্যের ওয়াদা পূরণ। আর তারই আলোচনা করা হয়েছে إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ আয়াতে। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে রয়েছে চতুর্থ দানের আলোচনা। তাতে মুসলমানদের জন্য দু'টি নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। একটি হল সবার উপর তন্দ্রা নেমে আসার ফলে ক্লান্তি-শ্রান্তি বিদূরিত হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল বৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রটিকে তাদের জন্য সমতল আর শত্রুদের জন্য কাদাপূর্ণ করে দেওয়া।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কুফর ও ইসলামের সর্বপ্রথম এই সমর যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন মক্কার কাফির বাহিনী প্রথমে সেখানে পৌঁছে গিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়ে নেয়, যা উপরের দিকে ছিল। পানি ছিল তাদের নিকটে। পক্ষান্তরে মহানবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম সেখানে পৌঁছলে তাঁদেরকে অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নিম্নাঞ্চলে। কোরআনে করীম এই যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা এ সূরার বিয়াল্লিশতম আয়াতে এভাবে বিবৃত করেছেঃ- اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى---এর সবিস্তার বিশ্লেষণ পরবর্তীতে করা হবে।

রসূলে করীম (সা) প্রথম যেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন, সে স্থানের সাথে পরিচিত হযরত হোবাব ইবনে মুন্‌যির (রা) স্থানটিকে যুদ্ধের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! যে জায়গাটি আপনি গ্রহণ করেছেন, তা কি আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে গ্রহণ করেছেন, যাতে আমাদের কিছু বলার কোন অধিকার নেই, না কি শুধুমাত্র নিজের মত ও অন্যান্য কল্যাণ বিবেচনায় বেছে নিয়েছেন? হুযূর আকরাম (সা) বললেন, না, এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ নয়; এতে পরিবর্তনও করা যেতে পারে। তখন হোবাব ইবনে-মুন্‌যির (রা) নিবেদন করলেন, তাহলে এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মক্কী সর্দারদের বাহিনীর নিকটবর্তী একটি পানিপূর্ণ স্থান রয়েছে, সেটি অধিকার করাই হবে উত্তম। মহানবী (সা) তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে পানির জায়গাটি মুসলমানদের অধিকারে নিয়ে নেন। একটি হাউজ বানিয়ে তাতে পানির সঞ্চয় গড়ে তোলেন।

এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মো'আয (রা) নিবেদন করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার জন্য কোন একটি সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার সওয়ারীগুলিও আপনার কাছেই থাকবে।

এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আল্লাহ যদি আমা-দিগকে বিজয় দান করেন, তবে তো এটাই উদ্দেশ্য। আর যদি খোদানাখাস্তা অন্য কোন অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সে সমস্ত সাহাবায়ে-কিরামের সাথে গিয়ে মিশবেন, যাঁরা মদীনা-তাইয়্যেবায় রয়ে গেছেন। কারণ, আমার ধারণা, তাঁরাও একান্ত জীবন উৎসর্গকারী এবং আপনার সাথে মহব্বতের ক্ষেত্রে তাঁরাও আমাদের চাইতে কোন অংশে কম নয় আপনার মদীনা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁরা যদি একথা জানতেন যে, আপনাকে এহেন সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, তাহলে তাদের একজনও পেছনে থাকতেন না। আপনি মদীনায়

গিয়ে পৌঁছলে তাঁরা হবেন আপনার সহকর্মী। মহানবী (সা) তার এই বীরোচিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে দোয়া করলেন এবং তাঁর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। তাতে মহানবী (সা) এবং সিদ্দীকে আকবর (রা) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। হযরত মু'আয (রা) তাঁদের হিফাযতের জন্য তরবারি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম রাত। তিনশ' তের জন নিরস্ত্র লোকের মুকাবিলা নিজেদের চাইতে তিন গুণ অর্থাৎ প্রায় এক হাজার সশস্ত্র লোকের এক বাহিনীর সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত স্থানটিও ওদের দখলে। পক্ষান্তরে নিম্নাঞ্চল, তাও বালুময় এলাকা, যাতে চলাফেরাও কষ্টকর, সেটি পড়ল মুসলমানদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবেই পেরেশানী ও চিন্তা-দুর্ভাবনা সবারই মধ্যে ছিল; কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারণাও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি কর এবং এখনও আরাম করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যাপৃত রয়েছ। অথচ সবদিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভাল অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন। তাতে ঘুমানোর কোন প্রবৃত্তি থাক বা নাই থাক জবরদস্তি সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

হাফেয হাদীস আবূ ইয়ালা উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আলী মুর্তযা (রা) বলেছেন, বদর যুদ্ধের এই রাতে এমন কেউ ছিল না, যে ঘুমায়নি। শুধু রসূলে করীম (সা) সারা রাত জেগে থেকে ভোর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাযে নিয়োজিত থাকেন।

ইবনে কাসীর বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা) এ রাতে যখন স্বীয় 'আরীশ' অর্থাৎ সামিয়ানার নীচে তাহাজ্জুদ নামাযে নিয়োজিত ছিলেন তখন তাঁর চোখেও সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে ওঠে বলেন, হে আবূ বকর! সুসংবাদ শুন; এই যে জিবরাঈল (আ) টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি- سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের অর্থ এই যে, শীঘ্রই শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে যাবে এবং পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সামিয়ানার বাইরে এসে বিভিন্ন জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এটা আবূ জাহ্লের হত্যা স্থান, এটা অমুকের; সেটা অমুকের। অতপর ঘটনা তেমনিভাবে ঘটতে থাকে।----(তফসীরে-মাযহারী) আর বদর যুদ্ধে যেমন ক্লান্তি-পরিশ্রান্তি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি ঘটনা ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও।

সুফিয়ান সওরী (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, যুদ্ধাবস্থায় ঘুম আসাটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ, আর নামাযের সময় ঘুম আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।----(ইবনে কাসীর)

এ রাতে মুসলমানরা দ্বিতীয় যে নিয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল বৃষ্টি। এর ফলে গোটা সমরাঙ্গনের চেহারাই পাল্টে যায়। কুরাইশ সৈন্যরা যে জায়গাটি দখল করেছিল তাতে বৃষ্টি হয় খুবই তীব্র এবং সারা মাঠ জুড়ে কাদা হয়ে গিয়ে চলাচলই দুষ্কর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেখানে মহানবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম অবস্থান করছিলেন, সেখানে বালুর কারণে চলাচল করা ছিল দুষ্কর। বৃষ্টি এখানে অল্প হয়। যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে দিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেওয়া হয়।

উল্লিখিত আয়াতে এ দু'টি নিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে। ১ নিদ্রা ও ২. বৃষ্টি, যাতে গোটা মাঠের রূপই বদলে যায় এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের মন থেকে সে সমস্ত শয়তানী ওয়াসওয়াসা ধুয়ে-মুছে যায় যে, আমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও পরাজিত ও পতিত বলে মনে হচ্ছে, অথচ শত্রুরা অন্যায়ের উপর থেকেও শক্তি-সামর্থ্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন তোমাদের প্রশান্তি দান করার জন্য; আর তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করছিলেন, যেন তোমাদের পবিত্র করে দেন এবং যেন তোমাদের মন থেকে শয়তানী ওয়াসওয়াসা দূর করে দেন। আর যেন তোমাদের মনকে সুদৃঢ় করেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে পঞ্চম নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদরের সমরাঙ্গনে মুসলমানদের দেওয়া হয়েছে। তা'হল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদের সাহস দান করতে থাক। আমি এখনই কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিচ্ছি। বস্তুত তোমরা কাফিরদের গর্দানের উপর অস্ত্রের আঘাত হান; তাদের মার দলে দলে।

এভাবে ফেরেশতাদের দু'টি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমত মুসলমান-দের সাহস বৃদ্ধি করবে। এ কাজটি ফেরেশতা কর্তৃক মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবৃদ্ধি করা কিংবা তাঁদের সাথে মিশে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের দৈব ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তি-শালী করেও হতে পারে। যা হোক, তাঁদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, ফেরেশতারা নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফিরদের উপর আক্রমণও কর-বেন। সুতরাং এ আয়াতের দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতারা উভয় দায়িত্বই যথাযথ সম্পাদন করেছেন। মুসলমানদের মনে দৈব ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে তাদের সাহস ও বল বৃদ্ধিও করেছেন এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। তদুপরি বিষয়টির সমর্থন কতিপয় হাদীসের বর্ণনার দ্বারাও হয়, যা তফসীরে দুররে-মনসুর ও মাযহারীতে

সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। তাতে ফেরেশতাদের যুদ্ধ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের চাক্ষুষ সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও ইসলামের এ সম্মুখ সমরে যা কিছু ঘটেছে তার কারণ ছিল কুফ্ফার কর্তৃক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ। আর যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার উপর আরোপিত হয় আল্লাহ্ তা'আলার সুকঠিন আযাব। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বদর যুদ্ধে একদিকে মুসলমানদের উপর নাযিল হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতরাজি, অপরদিকে কাফিরদের উপর মুসলমানদের মাধ্যমে আযাব নাযিল করে তাদেরই অসদাচরণের যৎসামান্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তার চেয়ে কঠিন শাস্তি হবে আখিরাতে। আর তাই বলা হয়েছে চতুর্থ আয়াতে ঃ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ

অর্থাৎ এটা হল আমার যৎসামান্য আযাব; এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রাখ যে, এর পরে কাফিরদের জন্য আরো আযাব আসবে, যা হবে অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও কল্পনাতীত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا
تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۝١٥ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا
لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ
جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١٦ فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ
الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝١٧ ذٰلِكُمْ
وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ۝١٨ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ
الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ
عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٩

(১৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফিরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। (১৬) আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ

করবে, অবশ্য সে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত---অন্যরা আল্লাহ্‌র গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুত সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান। সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ্‌ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। (১৭) আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত। (১৮) এটা তো গেল, আর জেনে রেখো, আল্লাহ্ নস্যাৎ করে দেবেন কাফিরদের সমস্ত কলা-কৌশল। (১৯) তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌঁছে গেছে। আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যদি তাই কর, তবে আমিও তেমনি করব। বস্তুত তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দল-বল, তা যত বেশিই হোক। জেনে রেখো, আল্লাহ্ রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফিরদের সাথে (জিহাদ করতে গিয়ে) মুখোমুখি হয়ে যাও, তখন তা থেকে পশ্চাদপসরণ করো না (অর্থাৎ জিহাদ থেকে পালিয়ে যাবে না)। আর যে ব্যক্তি এমন সময়ে (অর্থাৎ মুকাবিলার সময়ে) পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা নিজের দলের কাছে আশ্রয় নিতে আসার কথা স্বতন্ত্র। বাকি অন্যান্য যারা এমনটি করবে তারা আল্লাহ্‌র কোপানলে পতিত হবে এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থান। [فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ — আয়াতেও একটি কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হল এই যে, বদরের দিনে একমুঠো কাঁকর তুলে নিয়ে মহানবী (সা) কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন, যার কণা সমস্ত কাফিরের চোখে গিয়ে পড়ে এবং তারা পরাজিত হয়ে যায়। তাছাড়া সাহায্যের জন্য ফেরেশতাদের আসার বিষয়টি তো উপরে বলাই হল। সে প্রসঙ্গেই বলা হচ্ছে যে, যখন এমন আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী ঘটে গেছে, যা আপনার ক্ষমতা বহির্ভূত] তখন (এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত ফলশ্রুতির প্রেক্ষাপটে) আপনি তাদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) হত্যা করেননি; বরং আল্লাহ্ তা'আলা হত্যা করেছেন। তেমনি আপনি কাঁকর নিক্ষেপ করেননি—অবশ্য (বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নিশ্চয়ই) আল্লাহ্ তা'আলা তা নিক্ষেপ করেছেন (এবং প্রকৃত ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলার হওয়া সত্ত্বেও হত্যার চিহ্নসমূহকে যে বান্দার ক্ষমতার উপর চিহ্নিত করে দিয়েছেন, তার তাৎপর্য হল,) যাতে তিনি মুসলমানদের নিজের পক্ষ থেকে (তাদের কর্মের জন্য প্রচুর) প্রতিদান দিতে পারেন। (আর আল্লাহ্‌র রীতি অনুযায়ী কোন কাজের প্রতিদান প্রাপ্তি নির্ভর করে সে কাজটি কর্তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার উপর।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা (সেই মু'মিনদের কথোপকথন) যথাযথ শ্রবণকারী (এবং তাদের

কার্যকলাপ ও অবস্থা সম্পর্কে) যথার্থ পরিজ্ঞাত। (সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে যেসব কথা তারা বলেছে, যুদ্ধকর্ম ও দুশ্চিন্তাজনক পরিস্থিতিতে তাদেরকে যে ক্লান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে, আমি সে সমস্তই অবগত। আমি সেজন্য তাদেরকে প্রতিদান দেব।) এই তো গেল এক কথা। দ্বিতীয় বিষয়টি হল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল কাফিরদের কলা-কৌশলগুলোকে নস্যাৎ করে দেয়া। (বস্তুত অধিক দুর্বলতা তখনই প্রকাশ পায়, যখন নিজের সমকক্ষতা সম্পন্ন কিংবা দুর্বলের হাতে পরাভূত হতে হয়। আর তাও মু'মিনদের হাতে পরাজয়ের লক্ষণ প্রকাশের উপর নির্ভরশীল। অন্যথায় বলতে পারত যে, আমাদের কৌশল তো দৃঢ়ই ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার দৃঢ়তর কৌশলের সামনে টিকতে পারেনি। এতে করে পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করতে গিয়ে তাদের সাহস দুর্বল হত না। কারণ তারা তাঁদেরকে দুর্বল বলেই মনে করত।) যদি তোমরা মীমাংসা কামনা কর, তবে সে মীমাংসা তো তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েই গেছে—(তা হল এই যে, যারা ন্যায়ের উপর ছিল, তাদের বিজয় হয়েছে।) আর যদি (এখন সত্য বিষয়টি প্রকৃষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তোমরা রসূলে করীম (সা)-এর বিরোধিতা থেকে) বিরত হয়ে যাও, তবে তা তোমাদের পক্ষে খুবই উত্তম। পক্ষান্তরে (এখনো যদি বিরত না হও; বরং) তোমরা পুনরায় সে কাজই কর (অর্থাৎ বিরোধিতা), তবে আমি আবার এ কাজই করব (অর্থাৎ তোমাদের পরাজিত করব এবং মুসলমানদের জয়ী করব।) আর (যদি তোমাদের মনে তোমাদের সংগঠনের জন্য কোন অহংকার থাকে যে, এবার এর চেয়েও বেশি পরিমাণে সমাবেশ করব, তবে মনে রেখো) তোমাদের সংগঠন তোমাদের এতটুকু কাজে লাগবে না, তা যতই হোক না কেন। আর প্রকৃত বিষয় হল এই যে, (আসলে) আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের সাথে রয়েছেন (অর্থাৎ তিনি তাদেরই সাহায্যকারী। অবশ্য কখনও কোন উপসর্গের দরুন তাদের বিজয়ের বিকাশ না ঘটলেও বিজয়দানের প্রকৃত পাত্র এরাই। কাজেই তাদের সাথে মুকাবিলা করা নিজেরই ক্ষতি সাধনের নামান্তর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতের প্রথম দু'টিতে ইসলামের একটি সমরনীতি বাতলে দেয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে زَحْفًا শব্দের মর্মার্থ হল, উভয় বাহিনীর মুকাবিলা ও মুখোমুখি সংঘর্ষ। অর্থাৎ এমনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়।

দ্বিতীয় আয়াতে এই হুকুমের আওতা থেকে একটি অব্যাহতি এবং না-জায়েয পন্থায় পালনকারীদের সুকঠিন আযাবের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

দু'টি অবস্থার ক্ষেত্রে অব্যাহতি রয়েছে : إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ

مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েয রয়েছে। প্রথমত, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র একটি যুদ্ধের কৌশলস্বরূপ, শত্রুকে দেখাবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের কোন উদ্দেশ্য থাকবে না; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কাবস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটাই হল لَا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ -এর অর্থ। কারণ, تَحَرُّف অর্থ হয় কোন একদিকে ঝুঁকে পড়া।---(রূহুল মা'আনী)

দ্বিতীয়ত, বিশেষ কোন অবস্থা---যাতে সমরক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে, তা হল এই যে, নিজেদের উপস্থিত সৈন্যদের দুর্বলতা বোধ করে সেজন্য পেছনের দিকে সরে আসা যাতে মুজাহিদরা অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে সমর্থ হয় وَمُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ -এর অর্থ তাই। কারণ, تَحَيُّز-এর আভিধানিক অর্থ হল মিলিত হওয়া এবং فِئَةٍ অর্থ দল। কাজেই এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গণ থেকে পেছনের দিকে সরে আসলে তা জায়েয।

এই স্বাতন্ত্রের বর্ণনার পর সেসব লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা এই স্বতন্ত্রাবস্থা ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে কিংবা পশ্চাদপসরণ করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَقَدْ بَاۤءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যারা পালিয়ে যায়, তারা আল্লাহ্ তা'আলার গযব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর সেটি হল নিকৃষ্ট অবস্থান।

এ আয়াত দু'টির দ্বারা এই নির্দেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, শক্তি ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যত বেশিই হোক না কেন, মুসলমানদের জন্য তাদের মুকাবিলা থেকে পশ্চাদপসরণ করা হারাম, দু'টি স্বতন্ত্র অবস্থা ব্যতীত। তা হল এই যে, এই পশ্চাদপসরণ পলায়নের উদ্দেশ্যে হবে না; বরং তা হবে পাঁয়তারা, পরিবর্তন কিংবা শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পুনরাক্রমণের উদ্দেশ্যে।

বদর যুদ্ধকালে যখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন এটাই ছিল সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য সংখ্যার সাথে প্রতিপক্ষের কোন তুলনা করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়। বদর যুদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র

তিনশ তের জনকে মুকাবিলা করতে হচ্ছিল তিন গুণ অর্থাৎ এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। তারপরে অবশ্য এই হুকুমটি শিথিল করার জন্য সূরা আন্‌ফালের ৬৫ ও ৬৬ তম আয়াত নাযিল করা হয়। ৬৫তম আয়াতে বিশজন মুসলমানকে দু'শ কাফিরের সাথে এবং একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফিরের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়। তারপর ৬৬তম আয়াতে তা আরো শিথিল করার জন্য এ বিধান অবতীর্ণ হয়ঃ اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ... فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ অর্থাৎ এখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এই বিধান জারি করেছেন যে, দৃঢ়চিত্ত মুসলমান যদি একশ হয় তবে তারা দু'শ কাফিরের উপর জয়ী হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় মুসলমানদেরই জয়ী হওয়ার আশা করা যায়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা জায়েয নয়। তবে প্রতিপক্ষের সংখ্যা যদি দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা জায়েয রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মুকাবিলা থেকে পালিয়ে যায়, তার পলায়ন পলায়ন নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি দু'জনের মুকাবিলা থেকে পালায় সে-ই পলাতক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হবে।----(রূহুল বায়ান) এখন এই হুকুমই কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অধিকাংশ উম্মত এবং চার ইমামের মতেও এটাই শরীয়তের নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা যতক্ষণ না দ্বিগুণের বেশি হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হারাম ও গোনাহে কবীরা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাতটি বিষয়কে মানুষের জন্য মারাত্মক বলে বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত। কাজেই গযওয়ায়ে হুনাইনের ঘটনায় সাহাবায়ে কিরামের প্রাথমিক পশ্চাদপসরণকে কোরআনে করীম একটি শয়তানী পদস্খলন বলে সাব্যস্ত করেছে, যা মহাপাপেরই দলীল। ইরশাদ হয়েছেঃ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ-

তাছাড়া তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মদীনায় এসে আশ্রয় নেন এবং মহানবী (সা)-র দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে অপরাধ স্বীকার করেন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক অপরাধীতে পরিণত হয়ে পড়েছি।

মহানবী (সা) অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে তাঁকে সান্ত্বনা দান করলেন। বললেনঃ بل انتم العكارون وانا فئتكم অর্থাৎ "তোমরা পলাতক নও ; বরং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে পুনর্বার আক্রমণকারী, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সে অতিরিক্ত শক্তি।" এতে মহানবী (সা) এ বাস্তবতাকেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তাঁদের পালিয়ে এসে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ সেই স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্ভুক্ত, যাতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গন ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ভীতি ও মহত্ত্ব-জ্ঞানের যে সুউচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি এই বাহ্যিক পশ্চাদপসরণেও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেজন্যই নিজেকে অপরাধী হিসাবে মহানবী (সা)-র খিদমতে উপস্থিত করেছিলেন।

তৃতীয় আয়াতে গযওয়ায়ে বদরের অপরাপর ঘটনা বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের হিদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে অধিকের সাথে অল্পের এবং সবলের সাথে দুর্বলের অলৌকিক বিজয়কে তোমরা নিজেদের চেষ্টার ফসল বলে মনে করো না; বরং সে মহান সত্তার প্রতি লক্ষ্য কর, যাঁর সাহায্য-সহায়তা গোটা যুদ্ধেরই চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

এ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তারই বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইবনে জরীর, তাবারী, হযরত বায়হাকী (র.) প্রমুখ মনীষী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিনে যখন মক্কার এক হাজার জওয়ানের বাহিনী টিলার পেছন দিক থেকে ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা একান্ত গর্বিত ও সদম্ভ ভঙ্গীতে উপস্থিত হয়। সে সময় রসূলে করীম (সা) দোয়া করেন, "ইয়া আল্লাহ্, আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী এই কুরাইশরা গর্ব ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে আসছে, আপনি বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথাশীঘ্র পূরণ করুন।"---(রূহুল বয়ান) তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আ) অবতীর্ণ হয়ে নিবেদন করেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ) আপনি একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে শত্রু বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন। তিনি তাই করলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে হাতেম হযরত ইবনে যায়েদের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) তিনবার মাটি ও কাঁকরের মুঠো তুলে নেন এবং একটি শত্রু বাহিনীর ডান অংশের উপর, একটি বাম অংশের উপর এবং একটি সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সেই এক কিংবা তিন মুষ্টি কাঁকরকে আল্লাহ্ একান্ত ঐশী-ভাবে এমন বিস্তৃত করে দেন যে, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকি ছিল না, যার চোখে অথবা মুখমণ্ডলে এই ধূলি ও কাঁকর পৌঁছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা শত্রু বাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। আর এই সুযোগে মুসলমানরা

তাদের ধাওয়া করে; ফেরেশতারা পৃথকভাবে তাঁদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিলেন।—(মাযহারী, রূহুল বয়ান)

শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কিছু লোক নিহত হয়, কিছু হয় বন্দী আর বাকি সবাই পালিয়ে যায় এবং ময়দান চলে আসে মুসলমানদের হাতে।

সম্পূর্ণ নৈরাশ্য ও হতাশার মধ্যে মুসলমানরা এই মহান বিজয় লাভে সমর্থ হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর তাদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। সাহাবায়ে কিরাম একে অপরের কাছে নিজের নিজের কৃতিত্বের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয়ঃ—فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ -আয়াত। এতে তাঁদেরকে হিদায়েত দান করা হয় যে, কেউ নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো না; যা কিছু ঘটেছে তা শুধুমাত্র তোমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টারই ফসল নয়; বরং এটা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত সাহায্য ও সহায়তারই ফল। তোমাদের হাতে যেসব শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তাদেরকে হত্যা করেছেন।

এমনিভাবে রসূলে করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ হয়েছেঃ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ অর্থাৎ আপনি যে কাঁকরের মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, স্বয়ং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন। সারমর্ম হচ্ছে যে, কাঁকর নিক্ষেপের এই ফলাফল যে, তা প্রতিটি শত্রু সৈন্যের চোখে পৌঁছে গিয়ে সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়, এটা আপনার নিক্ষেপের প্রভাবে হয়নি; বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

ما رمیت اذ رمیت گفت حق
کار ما بر کارها دارد سبق

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, মুসলমানদের জন্য জিহাদে বিজয় লাভের চাইতেও অধিক মূল্যবান ছিল এই হিদায়েতটি, যা তাদের মনমানসকে উপকরণ থেকে ফিরিয়ে উপকরণের স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং তাতে করে এমন অহংকার ও আত্মগর্বের অভিশাপ থেকে তাঁদেরকে মুক্তি দান করে, যার নেশায় সাধারণত বিজয়ী সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর বলে দেয়া হয়েছে যে, জয়-পরাজয় আমারই হুকুমের অধীন। আর আমার সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করে যারা অনুগত।

অতপর বলা হয়েছেঃ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا অর্থাৎ আমি

মু'মিনদের এই মহাবিজয় দিয়েছি তাদের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশ্যে। بلاء শব্দের শব্দগত অর্থ হল পরীক্ষা। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার পরীক্ষা কখনো বিপদাপদের সম্মুখীন করে, আবার কখনো ধন-দৌলত ও সাহায্য-বিজয় দানের মাধ্যমে হয়। بلاء حسن বলা হয় এমন পরীক্ষাকে যা আয়েশ-আরাম, ধনসম্পদ ও সাহায্য দানের মাধ্যমে নেয়া হয়। এতে দেখা হয় যে, এরা একে আমার অনুগ্রহের দান মনে করে শুকরিয়া আদায় করে, নাকি একে নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফল ধারণা করে গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত আমলকে বরবাদ করে দেয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কারও গর্বাহংকারের কোন অবকাশ নেই। মওলানা রূমীর ভাষায় ঃ

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ
جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

চতুর্থ আয়াতে এর পাশাপাশি এই বিজয়ের আরও একটি উপকারিতার কথা বাতলে দেয়া হয়েছে যে, ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ মুসলমানদের এ বিজয় এ কারণেও দেয়া হয়েছে যেন এর মাধ্যমে কাফিরদের পরিকল্পনা ও কলা-কৌশলসমূহকে নস্যাৎ করে দেয়া যায় এবং যাতে কাফিররা এ কথা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহায়তা আমাদের প্রতি নেই। এবং কোন কলা-কৌশল তথা পরিকল্পনাই আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে পরাজিত কুরাইশী কাফিরদের সম্বোধন করে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কুরাইশী বাহিনীর মক্কা থেকে বেরোবার সময় ঘটেছিল।

ঘটনাটি এই যে, কুরাইশ কাফিরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেবার পর মক্কা থেকে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে বাহিনী-প্রধান আবূ জেহেল প্রমুখ বায়তুল্লাহ্‌র পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিলেন। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দোয়া করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিজয়ের দোয়ার পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দোয়া করেছিল ঃ

"ইয়া আল্লাহ্! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশি হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি বেশি ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান করো।"—(মাযহারী)

এই নির্বোধরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় আমরাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হেদায়েতের উপর রয়েছি, কাজেই এ দোয়াটি আমাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এই দোয়ার মাধ্যমে তারা কামনা করছিল, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ

থেকে যেন হক ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল যখন আমরা বিজয় অর্জন করব, তখন এটাই হবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের সত্যতার ফয়সালা।

কিন্তু তারা এ কথা জানত না যে, এই দোয়ার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজে-দের জন্য বদদোয়া ও মুসলমানদের জন্য নেক-দোয়া করে যাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর কোরআনে করীম তাদের বাতলে দিল ঃ— اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ অর্থাৎ তোমরা যদি ঐশী মীমাংসা কামনা কর, তবে তা সামনে এসে গেছে। সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় সূচিত হয়েছে। وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ আর যদি তোমরা এখনও কুফরীজনিত শত্রুতা পরিহার কর, তাহলে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ আর তোমরা যদি আবারো নিজে-দের দুষ্টুমি ও যুদ্ধের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও মুসলমানদের সাহায্যের দিকে ফিরে যাব। وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ অর্থাৎ তোমাদের দল ও জোট যতই অধিক হোক না কেন, আল্লাহ্‌র সাহায্যের মুকাবিলায় তা তোমাদের কোন কাজেই লাগবে না। وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন মুসলমানদের সাথে রয়েছেন, তখন কোন দল তোমাদের কিই-বা কাজে লাগতে পারে ?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا
عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا
وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ
الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ
اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ
اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

(২০) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না। (২১) আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা বলে যে আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনে না। (২২) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির, যারা উপলব্ধি করে না। (২৩) বস্তুত আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কিছুমাত্র শুভ চিন্তা দেখতেন; তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। আর এখনই যদি তাদের শুনিয়ে দেন তবে তারা মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাবে। (২৪) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের যে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ্ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালনে বিমুখতা অবলম্বন করো না। আর তোমরা (বিশ্বাসগতভাবে) তো শোনই, (অর্থাৎ বিশ্বাসগতভাবে শোন, সেমতে আমলও করতে থেকো)। আর তোমরা (আনুগত্য পরিহারের ক্ষেত্রে) সে সমস্ত লোকের মত হয়ো না, যারা দাবি করে যে, আমরা শুনে নিয়েছি, (যেমন কাফিররা সাধারণভাবে এবং মুনাফিকরা বিশ্বাসগতভাবে শুনেছে বলে দাবি করছিল) অথচ তারা কিছুই শুনছিল না। (কারণ, উপলব্ধি ও বিশ্বাস উভয়টিরই উদ্দেশ্য হল ফলশ্রুতি। অর্থাৎ শোনার ফল হল সেমত আমল বা কাজ করা। কাজেই যে শ্রবণের সাথে আমলের সমন্বয় হয় না, তা কোন কোন কারণে বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে না শোনারই তুল্য হয়ে যায়—যাকে তোমরা নিজেরাও অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মনে কর। আর একথা নিশ্চিত যে, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে শুনে আমল না করে এবং একজন বিশ্বাস-ভক্তি ব্যতীত শ্রবণকারী যা না শোনারই তুল্য, এতদুভয়ের মন্দ হওয়ার দিক দিয়ে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। কেননা, একজন কাফির এবং একজন পাপী সমান নয়। সুতরাং) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিকৃষ্টতর সৃষ্টি সে সমস্ত লোকই, যারা (সত্য ও ন্যায়কে সবিশ্বাসে শোনার ব্যাপারে) বধির (এবং সত্য কথা বলার ব্যাপারে) মূক। (পক্ষান্তরে) যারা (সত্য ও ন্যায় বিষয়ক একটুও উপলব্ধি করে না, আর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যারা সেমতে আমল করতে গিয়ে শৈথিল্য পোষণ করে তারা নিকৃষ্টতর না হলেও নিকৃষ্ট অবশ্যই। অথচ নিকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়)। আর (যাদের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা বিশ্বাস সহকারে শোনে না, তার কারণ হল এই যে, তাদের মধ্যে সৎ জ্ঞানের একটা বিরাট অভাব রয়েছে, আর তা হল সত্যানুসন্ধিৎসা। কারণ বিশ্বাসের উৎসমূল হল অনুসন্ধান ও প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। এ মুহূর্তে যদি বিশ্বাস নাও থাকে, কিন্তু অন্ততপক্ষে মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা থাকতে হবে। পরে এই উৎকণ্ঠা ও প্রাপ্তির স্পৃহার বরকতেই এক সময় তা যে সত্য ও ন্যায়, তা প্রতিভাত হয়ে যায় এবং সেই উৎকণ্ঠা বিশ্বাসে পরিণত হয়। এরই উপর শ্রবণের উপকারিতা

নির্ভরশীল। সুতরাং তাদের মধ্যে এই সৎগুণটির অভাব রয়ে গেছে। 'বস্তুত) আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে কোন রকম সৎগুণ দেখতেন (অর্থাৎ তাদের মধ্যে উল্লিখিত সৎগুণ বিদ্যমান থাকত; কারণ, সৎগুণের উপস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলার অবগতি অবশ্য-ম্ভাবী। সুতরাং এখানে অপরিহার্য বিষয়টির উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। 'যদি কোন সৎগুণ থাকত' কথাটি এজন্য বলা হয়েছে যে, এমন কোন সৎগুণ যখন নেই যার উপর নাজাত তথা আখিরাতের মুক্তি নির্ভরশীল, তখন যেন কোন গুণই নেই। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যদি সত্য ও ন্যায়ের অনুসন্ধিৎসা বিদ্যমান থাকত) তাহলে (আল্লাহ্ তা'আলা) তাদেরকে (বিশ্বাস সহকারে) শোনার তওফীক দান করতেন। (যেমন, ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে।) আর যদি (আল্লাহ্ তা'আলা) তাদেরকে বর্তমান অবস্থাতেই (অর্থাৎ অনুসন্ধিৎসার অবর্তমানেই) শুনিয়ে দেন, (যেমন, কখনো কখনো বাহ্যিক কানে শুনে নেয়) তবে অবশ্যই তারা অনীহাভরে তা অমান্য করবে (অর্থাৎ চিন্তা-বিবেচনার পর ভুল প্রকাশিত হওয়ার দরুন অমান্য করেছে এমন নয়। কারণ এখানে ভুলের কোন নাম-নিশানাই নেই। বরং বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এরা এদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করে না। আর) হে ঈমানদারগণ, (উপরে তোমাদেরকে হুকুম মান্য করার ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছি, মনে রেখো তাতে তোমাদেরই মঙ্গল নিহিত। সেটা হল অনন্ত জীবন। কাজেই) তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম মান্য করো যখন রসূল (যাঁর হুকুম বা বাণী আল্লাহ্রই বাণী) তোমাদের জীবন দানকারী বিষয়ের (অর্থাৎ যে দীনের মাধ্যমে অনন্ত জীবন লাভ হয় তার) প্রতি আহবান করেন। (আর তাতে যখন তোমাদেরই লাভ তখন সেমতে আমল না করার কোনই কারণ থাকতে পারে না।) আর এ প্রসঙ্গে (দু'টি বিষয় আরো) জেনে রাখ—(এক) আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান (দুইভাবে। প্রথমত মু'মিনের অন্তরে ইবাদত-বন্দেগীর বরকতে কুফরী ও পাপকে আসতে দেন না। দ্বিতীয়ত কাফিরদের অন্তরে তার বিরোধিতার অশুভ পরিণতিতে ঈমান ও ইবাদতকে আসতে দেন না। এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, ইবাদতের নিয়মানুবর্তিতা অত্যন্ত উপকারী; আর বিরোধিতা ও হঠকারিতা একান্ত ধ্বংসাত্মক ব্যাপার।) আরো (জেনে রাখ) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তোমাদের সমবেত হতে হবে (তখন আনুগত্যের জন্য প্রতিদান এবং বিরোধিতার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। এতেও আনুগত্যের উপকারিতা ও বিরোধিতার অপকারিতা প্রমাণিত হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বদর যুদ্ধের যে সমস্ত ঘটনা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মুসলমান ও কাফির উভয়ের জন্যই বহু তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। ঘটনার মধ্যভাগে সেগুলোর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদাহরণত বিগত আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের পরাজয় ও অপমানের বিবরণ দেওয়ার পর বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

অর্থাৎ সর্বপ্রকার উপকরণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার মুশরিকদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা। এতে সে সমস্ত লোকের জন্য এক চরম শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে, যারা আসমান-যমীনের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিকের পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও গায়েবী শক্তিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র স্থূল ও জড়-উপকরণ এবং শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে কিংবা আল্লাহ্র না-ফরমানী করা সত্ত্বেও তাঁর সাহায্য লাভের ভ্রান্ত আশার মাধ্যমে নিজের সাথে প্রতারণা করে।

উল্লিখিত আয়াতে এরই দ্বিতীয় আরেকটি দিক মুসলমানদের সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা হল এই যে, মুসলমানরা তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এই যে সাহায্য, এটা হল আল্লাহ্র প্রতি তাঁদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

"ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য অবলম্বন কর এবং তাতে স্থির থাক। অতপর এ বিষয়টির প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ অর্থাৎ কোরআন ও সত্যের বাণী শুনে নেবার পরেও তোমরা আনুগত্য বিমুখ হয়ো না।

শুনে নেবার অর্থ সত্য বিষয়টি শুনে নেওয়া। শোনার চারটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। (১) কোন কথা কানে নিল সত্য, কিন্তু না বুঝতে চেষ্টা করল, না বুঝল এবং নাই-বা তাতে বিশ্বাস করল আর না সেমত আমল করল। (২) কানে শুনল এবং তা বুঝলও, কিন্তু না করল তাতে বিশ্বাস, না করল আমল। (৩) শুনল, বুঝল এবং বিশ্বাসও করল, কিন্তু তাতে আমল করল না (৪) শুনল, বুঝল, বিশ্বাস করল এবং সেমতে আমলও করল।

বলা বাহুল্য, শোনার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয় শুধুমাত্র চতুর্থ পর্যায়ে যা পরিপূর্ণ মু'মিনদের স্তর। বস্তুত প্রাথমিক তিনটি পর্যায়ে শ্রবণ থাকে অসম্পূর্ণ। কাজেই এ রকম শোনাকে একদিক দিয়ে না শোনাও বলা যেতে পারে, যা পরবর্তী আয়াতে আলোচিত হবে। যা হোক, তৃতীয় পর্যায়ে শ্রবণ, যাতে সত্যকে শোনা, বোঝা এবং বিশ্বাস বর্তমান থাকলেও তাতে আমল নেই। এতে যদিও শোনার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না, কিন্তু বিশ্বাসেরও একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাও সম্পূর্ণভাবে বেকার যাবে না, এই স্তরটি হল গোনাহ্গার মুসলমানদের স্তর। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে

যাতে শুধু শোনা ও বোঝা বিদ্যমান, কিন্তু না আছে তাতে বিশ্বাস, না আছে আমল--- এটা মুনাফিকদের স্তর। এরা কোরআনকে শুনে, বুঝে এবং প্রকাশ্যভাবে বিশ্বাস ও আমলের দাবিও করে, কিন্তু বাস্তবে তা বিশ্বাস ও আমলহীন। আর প্রথম পর্যায়ের শ্রবণ হল কাফির-মুশরিকদের, যারা কোরআনের আয়াতগুলো কানে শুনে সত্যই, কিন্তু কখনও তা বুঝতে কিংবা তা নিয়ে চিন্তা করার প্রতি লক্ষ্য করে না।

উল্লিখিত আয়াতে মুসলমানগণকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তোমরা তো সত্য কথা শুনছ, বুঝছ এবং তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসও রয়েছে, কিন্তু তারপর তাতে পুরোপুরিভাবে আমল করো, আনুগত্যে অবহেলা করো না। তাই শ্রবণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়েই অধিকতর তাগিদ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মুখে একথা বলে সত্য যে, আমরা শুনে নিয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই শোনেনি। সে সমস্ত লোক বলতে উদ্দেশ্য হল সাধারণ কাফিরকুল, যারা শোনার দাবি করে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করে বলে দাবি করে না এবং এতে মুনাফিকও উদ্দেশ্য যারা শোনার সাথে সাথে বিশ্বাসেরও দাবিদার। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা এবং সঠিক উপলব্ধি থেকে এতদুভয় সম্প্রদায়ই বঞ্চিত। কাজেই তাদের এই শ্রবণ না শোনারই শামিল। মুসলমানদের এদের অনুরূপ হতে বারণ করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত লোকের কঠিন নিন্দা করা হয়েছে, যারা সত্য ও ন্যায়ের বিষয় গভীর মনোযোগ ও নিবিষ্টতার সাথে শ্রবণ করে না এবং তা কবূলও করে না। এহেন লোককে কোরআনে করীম চতুষ্পদ জীব-জন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করেছে। ইরশাদ করেছে ঃ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ।

اَلدَّوَابُّ শব্দটি دَابَّةٌ এর বহুবচন। অভিধান অনুযায়ী যমীনের উপর বিচরণকারী প্রতিটি বস্তুকেই دَابَّةٌ বলা হয়। কিন্তু সাধারণ প্রচলন ও পরিভাষায় دَابَّةٌ বলা হয় শুধুমাত্র চতুষ্পদ জন্তুকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ্‌র নিকট সে সমস্ত লোকই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ জীব তুল্য, যারা সত্য ও ন্যায়ের শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মূক। বস্তুত মূক ও বধিরদের মধ্যে সামান্য বুদ্ধি থাকলেও তারা ইঙ্গিত-ইশারায় নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করে এবং অন্যের কথা উপলব্ধি করে নেয়। অথচ এরা মূক ও বধির হওয়ার সাথে

সাথে নির্বোধও বটে। বলা বাহুল্য, যে মূক-বধির বুদ্ধি বিবর্জিতও হবে, তাকে বুঝবার এবং বোঝাবার কোনই পথ থাকে না।

এ আয়াতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষকে যে أحسن تقويم (সুগঠিত অঙ্গ সৌষ্ঠব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সৃষ্টির সেরা ও বিশ্বের বরেণ্য করা হয়েছে এই যাবতীয় ইন্‌'আম ও কৃপা শুধু সত্যের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যখন মানুষ সত্য ও ন্যায়কে শুনতে, উপলব্ধি করতে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তখন এই সমুদয় পুরস্কার ও কৃপা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তার ফলে সে জানোয়ার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

তফসীরে রূহুল-বয়ান গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষ প্রকৃত সৃষ্টির দিক দিয়ে সমস্ত জীব-জানোয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ফেরেশতা অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু যখন সে তার অধ্যবসায়, আমল ও সত্যানুগত্যের সাধনায় ব্রতী হয়, তখন ফেরেশতা অপেক্ষাও উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি সত্যানুগত্যে বিমুখ হয় তখন নিকৃষ্টতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয় এবং জানোয়ার অপেক্ষাও অধম হয়ে যায়।

চতুর্থ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ

وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণকর দিক তথা সৎচিন্তা দেখতেন, তবে তাদেরকে বিশ্বাস সহকারে শোনার সামর্থ্য দান করতেন। কিন্তু বর্তমান সত্যানুরাগ না থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও ন্যায় কথা তাদেরকে শুনিয়ে দেন, তাহলে তারা অনীহাভরে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করবে।

এখানে কল্যাণকর দিক বা সৎচিন্তা বলতে সত্যানুরাগ বোঝানো হয়েছে। কারণ, অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় এবং এতেই বিশ্বাস ও আমলের সামর্থ্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে যার মাঝে সত্যানুরাগ বা অনুসন্ধিৎসা নেই, তাতে যেন কোন রকম কল্যাণ নেই। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যদি কোন রকম কল্যাণ থাকত, তবে তা আল্লাহ্ তা'আলার অবশ্যই জানা থাকত। যখন আল্লাহ্ তা'আলার জানা মতে তাদের মধ্যে কোন কল্যাণের চিন্তা তথা সৎচিন্তা নেই, তখন এ কথাই প্রতীয়মান হল যে, প্রকৃতপক্ষেই তারা যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আর এই প্রবঞ্চিত অবস্থায় তাদেরকে যদি চিন্তা-ভাবনা ও সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়, তবে তারা কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করবে না, বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়েই নেবে। অর্থাৎ তাদের এই বিমুখতা এ কারণে হবে না যে, তারা দীনের

মধ্যে কোন আপত্তিকর বিষয় দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃত-পক্ষে তারা সত্যের বিষয় কোন লক্ষ্যই করেনি।

এই বিবৃতির দ্বারা সেই তার্কিক সন্দেহটি দূর হয়ে যায়, যা শিক্ষিত লোকদের মনে উদয় হয়। তা হল এই যে, একটা কিয়াসের শেক্‌লে-আউয়াল। এর মধ্য থেকে হদ্দে আওসাতকে ফেলে দিলে ভুল ফলোদয় হয়। তার উত্তর এই যে, এখানে হদ্দে-আওসাতের পুনরাবৃত্তি নেই। কারণ, এখানে প্রথমোক্ত لاسمعهم এবং দ্বিতীয় اسمعهم—এর মর্ম পৃথক পৃথক। প্রথমোক্ত سماع (শ্রবণ) বলতে গ্রহণসহ শ্রবণ ও উপকারী শ্রবণ উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় سماع (শ্রবণ) বলতে শুধু নিষ্ফল শ্রবণ বোঝানো হয়েছে।

পঞ্চম আয়াতে পুনরায় ঈমানদারদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ পালন ও তাঁদের আনুগত্যের প্রতি এক বিশেষ ভঙ্গিতে হুকুম করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল তোমাদের যেসব বিষয়ের প্রতি আহবান জানান, তাতে আল্লাহ্ ও রসূলের নিজস্ব কোন কল্যাণ নিহিত নেই; বরং সমস্ত হুকুমই তোমাদের কল্যাণ ও উপকারার্থে দেওয়া হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ—اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলের কথা মান, যখন রসূল তোমাদের এমন বিষয়ের প্রতি আহ-বান জানান, যা তোমাদের জন্য সঞ্জীবক।

এ আয়াতে যে জীবনের কথা বলা হয়েছে, তাতে একাধিক সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেই কারণেই তফসীরকার আলিমরা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত অবলম্বন করেছেন। আল্লামা সুদ্দী (র) বলেছেন, সেই সঞ্জীবক বস্তুটি হল ঈমান। কারণ, কাফিররা হল মৃত। হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেছেন, সেটি কোরআন, যাতে দুনিয়া এবং আখিরাতে জীবন ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মুজাহিদের মতে তা হল সত্য। ইবনে-ইসহাক বলেন যে, সেটি হচ্ছে 'জিহাদ' যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। বস্তুত এ সমুদয় সম্ভাবনাই স্ব-স্ব স্থানে যথার্থ। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অর্থাৎ 'ঈমান', 'কোরআন' অথবা 'সত্যানুগত্য' প্রভৃতি এমনই বিষয় যদ্দ্বারা মানুষের আত্মা সঞ্জীবিত হয়। আর আত্মার জীবন হল বান্দা ও আল্লাহ্‌র মাঝে শৈথিল্য ও রিপু প্রভৃতির যে সমস্ত যবনিকা অন্তরায় থাকে সেগুলো সরে যাওয়া এবং যবনিকার তমসা কেটে গিয়ে নূরে-মা'রেফাতে নূর-এর স্থান লাভ।

তিরমিযী ও নাসায়ী (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন রসূলে করীম (সা) উবাই ইবনে কা'আব (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তখন উবাই ইবনে কা'আব (রা) নামায পড়ছিলেন। তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে হুযুর (সা)-এর

খদমতে গিয়ে হাযির হলেন। হুযূর (সা) বললেন, আমার ডাক সত্ত্বেও আসতে দেরি করলে কেন? হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা) নিবেদন করলেন, আমি নামাযে ছিলাম। হুযূর (সা) বললেন, তুমি কি اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীটি শোননি? উবাই ইবনে কা'আব (রা) নিবেদন করলেন, আগামীতে এরই অনুসরণ করব, নামাযের অবস্থায়ও যদি আপনি ডাকেন, সঙ্গে সঙ্গে হাযির হয়ে যাব।

এ হাদীসের প্রেক্ষিতে কোন কোন ফুকাহা বলেছেন, রসূলের হুকুম পালন করতে গিয়ে নামাযের মধ্যে যে কোন কাজই করা হোক, তাতে নামাযে ব্যাঘাত ঘটে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদিও নামাযের পরিপন্থী কাজ করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরে তা কাযা করতে হবে, কিন্তু রসূল যখন কাউকে ডাকেন, তখন সে নামাযে থাকলেও তা ছেড়ে রসূলের হুকুম তা'মীল করবেন।

এই হুকুমটি তো বিশেষভাবে রসূল (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু অপরাপর এমন কোন কাজ যাতে বিলম্ব করতে গেলে কোন কঠিন ক্ষতির আশংকা থাকে, তখনও নামায ছেড়ে দেওয়া এবং পরে কাযা করে নেওয়া উচিত। যেমন, নামাযে থেকে যদি কেউ দেখতে পায় যে, কোন অন্ধ ব্যক্তি কুয়ায় পড়ে যাবার কাছাকাছি চলে গেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে নামায ছেড়ে তাকে উদ্ধার করা কর্তব্য।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ অর্থাৎ জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে এবং উভয়টির মধ্যেই বিরাট তাৎপর্য ও শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়, যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্তব্য।

একটি অর্থ এই হতে পারে যে, যখনই কোন সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেলো; এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনীমত জ্ঞান কর। কারণ কোন কোন সময় মানুষের ইচ্ছার মাঝে আল্লাহ্ নির্ধারিত কাযা বা নিয়তি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে তখন আর নিজের ইচ্ছায় সফল হতে পারে না। কোন রোগ-শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোন কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হল আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনীমত মনে করা। আজকের কাজ কাল-কের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, একথা কারোই জানা নেই, কাল কি হবে।

من نمی گویم زیان کن یا بفکر سود باش
ای ز فرصت بے خبر در هر چه باشی زود باش

তাছাড়া এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, অন্য আয়াত : نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ—এ আল্লাহ্ তা'আলা যে মানুষের জীবন-শিরার চেয়েও নিকটবর্তী সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, মানবাত্মা সর্বক্ষণ আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোন বান্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তাঁর অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারও ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। সে কারণেই রসূলে করীম (সা) অধিকাংশ সময় এই দোয়া করতেন : يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك অর্থাৎ হে অন্তরসমূহের ওলট-পালটকারী, আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

এর সারমর্মও এই যে, আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ পালনে আদৌ বিলম্ব করো না এবং সময়ের অবকাশকে গনীমত মনে করে তৎক্ষণাৎ তা বাস্তবায়িত করে ফেল। একথা কারোই জানা নেই যে, অতপর সৎকাজের এই প্রেরণা ও আগ্রহ বাকি থাকবে কি না।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ
مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ
وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ
وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

(২৫) আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক, যা বিশেষত তাদের উপর পতিত হবে না; যারা তোমাদের মধ্যে জালিম এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌র আযাব অত্যন্ত কঠোর। (২৬) আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে অল্প, পরাজিত অবস্থায় পড়েছিলে দেশে; ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। অতপর তিনি তোমাদের আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদের শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। (২৭) হে ঈমানদারগণ, খেয়ানত করো না আল্লাহ্‌র সাথে ও রসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে। (২৮) আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। বস্তুত আল্লাহ্‌র নিকটে আছে মহা সওয়াব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর [যেভাবে তোমাদের পক্ষে নিজের সংশোধনের উদ্দেশ্যে আনুগত্য করা ওয়াজিব, তেমনিভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের সংশোধনকল্পে 'আমর-বিল মা'রূফ' ও 'নাহী আনিল মুন্‌কার' (তথা সৎকর্মের প্রতি আহবান ও অসৎকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখা)-এর নীতি অনুযায়ী সক্রিয়ভাবে অথবা মৌখিকভাবে কিংবা অসৎ লোকদের সাথে মেলা-মেশা বর্জন অথবা মনে মনে ঘৃণার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানোও ওয়াজিব। অন্যথায় সে অসৎ কর্মের আযাব যেমন এসব অসৎ কর্মীদের উপর বর্তাবে, তেমনি কোন না কোন পর্যায়ে মৌনতা অবলম্বনকারীদের উপরও পড়বে। কাজেই] তোমরা এহেন বিপদ থেকে বাঁচ, যা বিশেষত সেই সমস্ত লোকের উপরই আসবে না, যারা তোমাদের মধ্যে সে সমস্ত পাপে লিপ্ত হয়েছে। (বরং সেসব পাপানুষ্ঠান দেখেও যারা মৌনতা অবলম্বন করেছে, তারাও তাতে অংশীদার হয়ে পড়বে। আর তা থেকে বাঁচা এই যে, পাপানুষ্ঠান বা অসৎ কর্ম করতে দেখে মৌনতা অবলম্বন করো না।) আর এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সুকঠিন শাস্তিদানকারী (তাঁর শাস্তির প্রতি ভীত হয়ে মৌনতা থেকে বিরত থাক)। এবং (যেহেতু নিয়ামত ও দানের কথা স্মরণ করলে দাতার আনুগত্যের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহকে, বিশেষ করে) সে অবস্থার কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা (কোন এক সময় অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে সংখ্যায়ও) ছিলে অল্প এবং (শক্তির দিক দিয়েও মক্কা) নগরীতে দুর্বল বলে পরিগণিত হতে। (আর চরম এই দুর্বলতার দরুন তোমরা) শঙ্কিত থাকতে যে, (তোমাদের প্রতিপক্ষ না জানি) তোমাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। বস্তুত (এমনি অবস্থায়) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শান্তিপূর্ণভাবে মদীনায় বসবাস করার স্থান দিয়েছেন এবং তোমাদের স্বীয় সাহায্য-সহায়তার মাধ্যমে (সাজ-সরঞ্জামের দিক দিয়ে এবং জনসংখ্যা বাড়িয়েও) শক্তি দান করেছেন (যাতে তোমাদের সংখ্যাল্পতা, মানসিক দুর্বলতা এবং ছিন্নভিন্নতা প্রভৃতি সমস্ত ভয়ভীতি দূর হয়ে গেছে। আর তিনি যে তোমাদের বিপদই শুধু দূর করে দিয়েছেন তাই নয়, বরং তোমাদের দান করেছেন উচ্চ পর্যায়ের সচ্ছলতা। শত্রুদের উপর তোমাদের

বিজয় দানের মাধ্যমে) তোমাদের উত্তম উত্তম বস্তুসামগ্রী দান করেছেন, যাতে তোমরা (এই নিয়ামতসমূহের জন্য) শুকরিয়া আদায় কর (বস্তুত বড় শুকরিয়া হচ্ছে আনুগত্য)। হে ঈমানদারগণ, (আমি বিরোধিতা ও পাপ থেকে এ কারণে বারণ করছি যে, তোমাদের উপর আল্লাহ্ ও রসূলের কিছু হক রয়েছে, যার লাভালাভ তোমাদের নিকট ফিরে আসে। পক্ষান্তরে পাপ ও কৃতঘ্নতায় সে সমস্ত হক বিঘ্নিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সেটা তোমাদের লাভের জন্যই ক্ষতিকর। অতএব) তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের হক (বা অধিকার)-এর ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করো না। আর (এসবের পরিণতির প্রেক্ষাপটে বিষয়টি এভাবে বলা যেতে পারে যে, তোমরা) নিজেদের হেফাযতযোগ্য বিষয় (যা তোমাদের জন্য লাভজনক এবং যা কর্মের উপর নির্ণীত হয়) বিঘ্ন সৃষ্টি করো না। তাছাড়া তোমরা তো (তার অপকারিতা সম্পর্কে) অবগত রয়েছ। আর (অধিকাংশ সময় ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততির প্রীতি ও ভালবাসা আনুগত্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই তোমাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা এ বিষয়টি জেনে রাখ তোমাদের ধন-দৌলত ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি একটা পরীক্ষার বিষয় যাতে প্রতীয়মান হয়ে যায়, কারা এগুলোকে অগ্রাধিকার দেয় আর কারা আল্লাহ্র ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়। অতএব তোমরা এগুলোর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দিও না) অগত্যা (যদি এগুলোর লাভালাভের প্রতি লোভই হয়, তবে তোমরা) এ কথাটিও জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট (সে সমস্ত লোকের জন্য) অতি মহান প্রতিদান রয়েছে। (যারা আল্লাহ্র ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং যাদের নিকট আল্লাহ্-প্রীতির তুলনায় এই ধ্বংসশীল লাভালাভের কোন গুরুত্ব নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনে করীম গযওয়ায়ে বদরের কিছু বিস্তারিত বিবরণ এবং তাতে মুসলমানদের প্রতি নাযিলকৃত এন'আমসমূহের কথা উল্লেখের পর তা থেকে অর্জিত ফলাফল এবং অতপর সে প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রতি কিছু উপদেশ দান করেছে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ আয়াত থেকে তা আরম্ভ হয়। আলোচ্য এ আয়াতগুলো তারই কয়েকটি আয়াত।

এর মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে এমন সব পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য—বিশেষভাবে হিদায়ত করা হয়েছে, যার জন্য নির্ধারিত সুকঠিন আযাব শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে তফসীরবিদ ওলামায়ে-কিরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কোন কোন মনীষী বলেন, 'আম্র বিল্ মা'রূফ' তথা সৎ কাজের নির্দেশ দান এবং 'নাহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত করার চেষ্টা পরিহার

করাই হল এই পাপ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা নিজের এলাকায় কোন অপরাধ ও পাপানুষ্ঠান হতে না দেয়। কারণ যদি তারা এমন না করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও পাপকর্ম সংঘটিত হতে দেখে তা থেকে বারণ না করে, তবে আল্লাহ্ স্বীয় আযাব সবার উপরই ব্যাপক করে দেন। তখন তা থেকে না বাঁচতে পারে কোন গোনাহ্গার, আর না বাঁচতে পারে নিরপরাধ।

এখানে 'নিরপরাধ' বলতে সেসব লোককেই বোঝানো হচ্ছে, যারা মূল পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও 'আম্‌র বিল মা'রূফ' বর্জন করার পাপে পাপী। কাজেই এ ক্ষেত্রে এমন কোন সন্দেহ করার কারণ নেই যে, একজনের পাপের জন্য অন্যের উপর আযাব করাটা অবিচার এবং কোরআনী সিদ্ধান্ত—

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى —এর পরিপন্থী। কারণ, এখানে পাপী তার মূল পাপের পরিণতিতে এবং নিরপরাধরা তাদের 'আম্‌র বিল মা'রূফ' থেকে বিরত থাকার পাপের দরুন ধরা পড়েছে, কারো পাপ অন্যের কাঁধে চাপানো হয়নি।

ইমাম বগভী (র) 'শরহুস্‌সুন্নাহ্' ও 'মা'আলিন' নামক গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূল করীম (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন নির্দিষ্ট দলের পাপের আযাব সাধারণ মানুষের উপর আরোপ করেন না, যতক্ষণ না এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকায় পাপকর্ম সংঘটিত হতে দেখে তা বাধাদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয়নি। তবেই আল্লাহ্‌র আযাব সবাইকে ঘিরে ফেলে।

তিরমিযী ও আবূ দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রসূলে করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোন অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের সবার উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করবেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌র কানুনের সীমালংঘনকারী গোনাহগার এবং যারা তাদের দেখেও মৌনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সেই পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদুভয় শ্রেণীর উদাহরণ এমন একটি সামুদ্রিক জাহাজের মত. যাতে দু'টি শ্রেণী রয়েছে এবং নিচের শ্রেণীর লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়োজনে পানি নিয়ে যায়, যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নিচের লোকেরা এমন অবস্থা দেখে জাহাজের তলায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ করতে শুরু করে। কিন্তু উপরের লোকেরা এহেন

কাণ্ড দেখেও বারণ করে না। এতে বলাই বাহুল্য যে, গোটা জাহাজেই পানি ঢুকে পড়বে। আর তাতে নিচের লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও বাঁচতে পারবে না।

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে অনেক তফসীরবিদ মনীষী সাব্যস্ত করেছেন যে, এ আয়াতে فِتْنَةً (ফিতনাহ) বলতে এই পাপ অর্থাৎ "সৎ কাজে নির্দেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান" বর্জনকেই বোঝানো হয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এই বলার উদ্দেশ্য হল জিহাদ বর্জন করা। বিশেষ করে এমন সময়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকা, যখন আমিরুল-মু'মিনীন তথা মুসলমানদের নেতার পক্ষ থেকে জিহাদের জন্য সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আহবান জানানো হয় এবং ইসলামী 'শেয়ার'-সমূহের হিফাযতও তার উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তখন জিহাদ বর্জনের পরিণতি শুধু জিহাদ বর্জনকারীদের উপরই নয়; বরং সমগ্র মুসলিম জাতির উপর এসে পড়ে। কাফিরদের বিজয়ের ফলে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য বহু নিরপরাধ মুসলমান হত্যার শিকারে পরিণত হয়। তাদের জানমাল বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় 'আযাব' অর্থ হবে পার্থিব বিপদাপদ।

এই ব্যাখ্যা ও তফসীরের সামঞ্জস্য হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে জিহাদ বর্জনকারীদের প্রতি ভৎসনা করা হয়েছে ঃ- وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ এবং يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ প্রভৃতি পরবর্তী আয়াতগুলোও এরই বর্ণনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

গযওয়ায়ে ওহুদের সময় যখন কতিপয় মুসলমানের পদস্খলন হয়ে যায় এবং ঘাঁটি ছেড়ে নিচে নেমে আসেন, তখন তার বিপদ শুধু তাদের উপরই আসেনি, বরং সমগ্র মুসলিম বাহিনীর উপরই আসে। এমনকি স্বয়ং মহানবী (সা)-কেও সে যুদ্ধে আহত হতে হয়।

দ্বিতীয় আয়াতেও আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্যকে সহজ করার জন্য এবং তাঁর প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের তাদের বিগত দিনের দুরবস্থা, দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব এবং পরে স্বীয় অনুগ্রহ ও নিয়ামতের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদেরকে শক্তি ও শান্তিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ

أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ, তোমরা সে অবস্থার কথা স্মরণ কর, যা হিজরতের পূর্বে মক্কা মুআয্যমায় ছিল। তখন তোমরা সংখ্যায় যেমন অল্প ছিলে তেমনি শক্তি-তেও। সর্বক্ষণ আশংকা লেগেই থাকত যে, শত্রুরা তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মদীনায় উত্তম অবস্থান দান করেছেন। শুধু অবস্থান বা আশ্রয় দান করেননি; বরং স্বীয় সমর্থন ও সাহায্যের মাধ্যমে তাদেরকে দান করেছেন শক্তি, শত্রুর উপর বিজয় এবং বিপুল মালামাল। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ অর্থাৎ তোমাদের অবস্থার এহেন পরিবর্তন, আল্লাহ্‌র উপঢৌকন এবং নিয়ামতরাজি দানের উদ্দেশ্য হল, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, শুক্‌রিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশও তাঁর নির্দেশ বা হুকুম-আহকাম পালনের উপরেই নির্ভরশীল।

তৃতীয় আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার হকসমূহ কিংবা পারস্পরিকভাবে বান্দার হকসমূহের খেয়ানত করো না; হক আদায়ই করবে না কিংবা আদায় করলেও অন্য কোন রকম শৈথিল্যের সাথে আদায় করবে এমন যেন না হয়। আয়াতের শেষ ভাগে—وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ বলে এ কথাই বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তো খেয়ানতের অপকারিতা ও বিপদ সম্পর্কে জানই। তারপরেও সেদিকে পদক্ষেপ নেওয়া মোটেও বুদ্ধিমত্তার কথা নয়। আর যেহেতু আল্লাহ্ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফলতি ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণত মানু-ষের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ এ কথা জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনা।

'ফিতনা' শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়; আবার আযাবও হয়। তাছাড়া এমন সব বিষয়কেও ফিতনা বলা হয়, যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। কোরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে এই তিন অর্থেই 'ফিতনা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুত এখানে তিনটি

অর্থেরই সুযোগ রয়েছে। কোন কোন সময় সম্পদ ও সন্তান মানুষের জন্য পৃথিবীতেই প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর জন্য শৈথিল্য ও পাপে লিপ্ত হয়ে আযাবের কারণ হয়ে পড়াটা একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমত ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করাই আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য যে, আমার এসব দান গ্রহণ করার পর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, না অকৃতজ্ঞ হও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় জড়িয়ে গিয়ে যদি আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিই তোমাদের জন্য আযাব হয়ে দাঁড়াবে। কোন সময় তো পার্থিব জীবনেই এসব বস্তু মানুষকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে দেয় এবং দুনিয়াতে সে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিকে আযাব বলে মনে করতে শুরু করে। অন্যথায় এ কথাটি অপরিহার্য যে, যে ধন-সম্পদ দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহকামের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে কিংবা ব্যয় করা হয়েছে, সে সম্পদই আখিরাতে তার জন্য সাপ, বিচ্ছু ও আগুনে পোড়ার কারণ হবে। যেমন কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। আর তৃতীয় অর্থ এই যে, এসব বস্তু-সামগ্রী আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টি তো একান্তই স্পষ্ট যে, এসব বস্তু আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে গাফিল করে তোলে এবং তাঁর হুকুম-আহকামের প্রতি অমনোযোগী করে দেয়, তখন সেগুলোই আযাবের কারণ হয়ে যায়। আয়াত শেষে বলা হয়েছে ঃ وَأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে মহান প্রতিদান।

এ আয়াতের বিষয়বস্তু সমস্ত মুসলমানদের জন্যই ব্যাপক ও বিস্তৃত। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ মনীষীর মতে আয়াতটি গয্‌ওয়ায়ে 'বনু কুরায়যা'-র ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত আবূ লুবাবা (রা)-র কাহিনীকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিল। মহানবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম বনু কুরায়যার দুর্গটিকে দীর্ঘ একুশ দিন যাবত অবরোধ করে রেখেছিলেন। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা দেশ ত্যাগ করে শাম দেশে (সিরিয়া) চলে যাবার জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু তাদের দুষ্টুমির প্রেক্ষিতে তিনি তা অগ্রাহ্য করেন এবং বলে দেন যে, সন্ধির একটি মাত্র উপায় আছে যে, সা'দ ইবনে মু'আয্ (রা) তোমাদের ব্যাপারে যে ফয়সালা করবেন তোমরা তাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করবে। তারা আবেদন জানাল, সা'দ ইবনে মু'আয (রা)-এর পরিবর্তে বিষয়টি আবূ লুবাবা (রা)-র উপর অর্পণ করা হোক। তার কারণ, আবূ লুবাবা (রা)-র আত্মীয়স্বজন ও কিছু বিষয়-সম্পত্তি বনু কুরায়যার মধ্যে ছিল। কাজেই তাদের ধারণা ছিল যে, তিনি আমাদের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন। যা হোক, হুযূর আকরাম (সা) তাদের আবেদনক্রমে হযরত আবূ লুবাবা (রা)-কেই পাঠিয়ে দিলেন। বনু কুরায়যার সমস্ত নারী-পুরুষ তাঁর চারদিকে ঘিরে কাঁদতে আরম্ভ করল এবং জিজ্ঞেস করল,

যদি আমরা রসূলে করীম (সা)-এর হুকুমমত দুর্গ থেকে নেমে আসি, তাহলে তিনি আমাদের ব্যাপারে কিছুটা দয়া করবেন কি? আবূ লুবাবা (রা) এ বিষয়ে অবগত ছিলেন যে, তাদের এ ব্যাপারে সদয়াচরণের কোন পরিকল্পনা নেই। কিন্তু তিনি তাদের কান্না-কাটিতে এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনের মায়ায় কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়লেন এবং নিজের গলায় তলোয়ারের মত হাত ফিরিয়ে ইঙ্গিতে বললেন, তোমাদের জবাই করা হবে। এভাবে মহানবী (সা)-র পরিকল্পনার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়া হলো।

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসায় এ কাজ তিনি করে বসলেন বটে, কিন্তু সাথে সাথেই সতর্ক হয়ে অনুভব করলেন যে, তিনি খেয়ানত করে ফেলেছেন। সেখান থেকে যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন লজ্জা ও অনুতাপ তাঁর উপর এমন কঠিনভাবে চেপে বসে যে, হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার পরিবর্তে সোজা গিয়ে মসজিদে ঢুকে পড়লেন এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে নিজেকে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেন। তারপর এরূপ কসম খেয়ে নেন যে, যতক্ষণ না আমার তওবা কবূল হবে, এভাবে বাঁধা অবস্থায় থাকব; এভাবে যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তবুও। সুতরাং এভাবে সাত দিন পর্যন্ত বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তাঁর দেখাশোনা করেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং নামাযের সময় হলে বাঁধন খুলে দিতেন, আর তা থেকে ফারেগ হওয়ার পর আবার বেঁধে দিতেন। কোন রকম খানা-পিনার ধারে কাছেও যেতেন না। এমন কি ক্ষুধায় একেক সময় বেহুঁশ হয়ে পড়তেন।

প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন বললেন, সে যদি প্রথমেই আমার কাছে চলে আসত, তবে আমি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করতাম। কিন্তু এখন তাঁর তওবা কবূলের নির্দেশের জন্যই অপেক্ষা করতে হবে।

অতএব, সাতদিন অন্তে শেষ রাতে তাঁর তওবা কবূল হওয়ার ব্যাপারে হুযূর (সা)-এর উপর আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। কোন কোন লোক তাঁকে এ সুসংবাদ জানান এবং বাঁধন খুলে দিতে চান। তাতে তিনি (আবূ লুবাবা) বলেন, যতক্ষণ না স্বয়ং মহানবী (সা) নিজ হাতে আমাকে বাঁধন-মুক্ত করবেন, আমি মুক্ত হতে চাই না। অতএব, হুযূর (সা) ভোরে যখন নামাযের সময় মসজিদে তশরীফ আনেন, তখন স্বহস্তে তাঁকে মুক্ত করেন। উল্লিখিত আয়াতে খেয়ানত ও ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততির মায়ার সামনে নতি স্বীকার করার যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, এ ঘটনা-টিই ছিল তার কারণ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ
عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۝٢٩ وَإِذْ
يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ

وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ
اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ
اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾ وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا
هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا
بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۖ وَمَا
كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾

(২৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, তবে তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান। (৩০) আর কাফিররা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য, তখন তারা যেমন চক্রান্ত করত তেমনি আল্লাহ্‌ও কৌশল করতেন। বস্তুত আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। (৩১) আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে তবে বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বলতে পারি; এ তো পূর্ববর্তী ইতিকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৩২) তাছাড়া তারা যখন বলতে আরম্ভ করে যে, ইয়া আল্লাহ্, এই যদি তোমার পক্ষ থেকে (আগত) সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক আযাব নাযিল কর। (৩৩) অথচ আল্লাহ্ কখনই তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না, যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ্ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আর) হে ঈমানদারগণ, (আনুগত্যের আরও বরকতের কথা শুন। তা হল এই যে,) যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ভীত (থেকে তাঁর আনুগত্য করতে) থাক তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একটি মীমাংসাপূর্ণ বস্তু দান করবেন। (এতে হিদায়ত ও মনের জ্যোতি, যার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মাঝে ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে জ্ঞানগত পার্থক্য স্থাপিত হয় এবং শত্রুর উপর বিজয় ও আখিরাতের নাজাতের বিষয় যাতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কার্যকর পার্থক্য সূচিত হয়, সবকিছুই এসে যায়।) আর তোমাদের

থেকে তোমাদের পাপসমূহকে দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ হচ্ছেন মহান অনুগ্রহের অধিকারী। (কাজেই আল্লাহ্ যে তোমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে আরও কি কি দান করবেন তার ধারণা কল্পনাও করা যায় না।) আর (হে মুহাম্মদ, নিয়ামতরাজির আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলমানদের নিকট এ বিষয়েও আলোচনা করুন যে, আপনার সম্পর্কে) কাফিররা যখন (নানা রকম হীন) পরিকল্পনা নিচ্ছিল যে, আপনাকে (কি) বন্দী করে রাখবে, না হত্যা করে ফেলবে, নাকি স্বদেশ থেকে বের করে দেবে, তখন তারা অবশ্য নিজ নিজ পরিকল্পনা নিচ্ছিল, কিন্তু (সেসব ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন। বস্তুত আল্লাহ্ হচ্ছেন সবচেয়ে সুনিপুণ ব্যবস্থাপক। (তাঁর ব্যবস্থার সামনে তাদের যাবতীয় পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং আপনি পরিপূর্ণ হিফাযতে রয়েছেন এবং অক্ষত অবস্থায় মদীনায় এসে পৌঁছেছেন। এভাবে তাঁর অব্যাহতি লাভ যেহেতু মু'মিনদের পক্ষে অশেষ সৌভাগ্যের চাবিকাঠি ছিল, কাজেই এ ঘটনাটি ব্যক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।) আর (সে কাফিরদের অবস্থা হল এই যে,) তাদের সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন বলে, আমরা (এগুলো) শুনেছি (এবং অনুধাবন করেছি যে, এগুলো কোন মু'জিযা নয়, কারণ) ইচ্ছা করলে আমরাও এমন সব কথা বলতে পারি। (কাজেই) এটি (অর্থাৎ কোরআন) তো (আল্লাহ্‌র কোন কালাম বা মু'জিযা প্রভৃতি) কোন কিছুই নয়; শুধুমাত্র সনদহীন এমন কিছু কথা যা পূর্ব থেকেই কথিত হয়ে আসছে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধর্মাবলম্বীরাও এমনি একত্ববাদ ও রিসালত প্রভৃতির দাবি করে আসছিল। তাদেরই কথিত বিষয়বস্তু আপনিও উদ্ধৃত করেছেন। আর তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য অবস্থা হল এই যে,) যখন তারা (নিজেদের গণ্ডমূর্খতার চরমাবস্থা প্রকাশ করতে গিয়ে এ কথাও) বলল যে, হে আল্লাহ্, এই কোরআন যদি বাস্তবিকই তোমার পক্ষ থেকে এসে থাকে, তবে (একে অমান্য করার কারণে) আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের উপর (অন্য কোন) বেদনাদায়ক আযাব নাযিল করে দাও (যা অস্বাভাবিকতার দিক দিয়ে প্রস্তর বর্ষণের মতই কঠিন হবে। কিন্তু এ ধরনের কোন আযাব নাযিল না হওয়ার দরুন কাফিররা নিজেদের সত্যতার উপর গর্ব করতে আরম্ভ করে) এবং (এ কথা উপলব্ধি করে না যে, তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করার পরেও বিশেষ কোন বাধার ফলেই তাদের উপর সেরূপ আযাব অবতীর্ণ হচ্ছে না। বস্তুত সে বাধা এই যে,) আল্লাহ্ এমন করবেন না যে, তাদের মাঝে আপনার সত্তা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর (এমন) আযাব দেবেন। তাছাড়া আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের ক্ষমা প্রার্থনার অবস্থায় (এমন) আযাব দেবেন না। [যদিও এই ক্ষমা প্রার্থনা তাদের ঈমান না থাকার দরুন আখিরাতে লাভজনক হবে না, কিন্তু তথাপি তা যেহেতু একটি সৎ কাজ, সুতরাং পার্থিব জীবনে কাফিরদের জন্যও তা লাভজনক হয়ে থাকে। মোদ্দাকথা, এ সমস্ত অস্বাভাবিক আযাবের পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হিসাবে রয়েছে। এক, মক্কা নগরীতে কিংবা পৃথিবীতে হুযূর আকরাম (সা)-এর বর্তমান থাকা এবং দুই, তাওয়াফ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তাদের

غفرا نكـ (হে পরওয়ারদিগার, আমাদের ক্ষমা কর) বলা যা হিজরত ও ওফাতের পরেও প্রচলিত ছিল। তাছাড়া হাদীসে আরও একটি প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ রয়েছে যে, তাদেরও হুযূর (সা)-এর উম্মতের মধ্যে হওয়া যদিও ঈমান গ্রহণ না করে। এই প্রতিবন্ধকতা কিংবা অস্বাভাবিক আযাবের পথে এই অন্তরায় কারও ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা না করা সত্ত্বেও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ই বস্তুত আযাবের পথে অন্তরায়। অবশ্য কোন কোন অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও কোন কোন অস্বাভাবিক আযাব বিশেষ কোন কল্যাণের ভিত্তিতে এসে যেতে পারে। যেমন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে চেহারার বিকৃতি প্রভৃতি আযাবের কথা হাদীসসমূহে উল্লেখ রয়েছে।]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে এ বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল যে, মানুষের জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি ফিতনা-বিশেষ। অর্থাৎ এগুলো সবই পরীক্ষার বিষয়। কারণ, এসব বস্তুর মায়ায় হেরে গিয়েই মানুষ সাধারণত আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি গাফিল হয়ে পড়ে। অথচ এই মহানিয়ামতের যৌক্তিক দাবি ছিল, আল্লাহ্র এহেন মহা অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি অধিকতর বিনত হওয়া।

আলোচ্য এ আয়াতসমূহের প্রথমটি সে বিষয়েরই উপসংহার। এতে বলা হয়েছে, যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে এই পরীক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করবে---যাকে কোরআন ও শরীয়তের ভাষায় 'তাক্ওয়া' বলা হয়---তাহলে সে এর বিনিময়ে তিনটি প্রতিদান লাভ করে। (১) ফুরকান, (২) পাপের প্রায়শ্চিত্ত (৩) মাগফিরাত বা পরিত্রাণ।

فرق ও فرقان দু'টি ধাতুর সমার্থক। পরিভাষাগতভাবে فرقان (ফুরকান) এমন সব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয়, যা দু'টি বস্তুর মাঝে প্রকৃষ্ট পার্থক্য ও দূরত্ব সূচিত করে দেয়। সেজন্যই কোন বিষয়ের মীমাংসাকে ফুরকান বলা হয়। কারণ, উহা হক ও না-হকের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যকেও ফুরকান বলা হয়। কারণ, এর দ্বারাও সত্যপন্থীদের বিজয় এবং তাদের প্রতিপক্ষের পরাজয় সূচিত হওয়ার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যই কোরআনে করীমে গযওয়ায়ে-বদরকে 'ইয়াওমুল ফুরকান' তথা পার্থক্যসূচক দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ আয়াতে বর্ণিত 'তাকওয়া' অবলম্বনকারীদের প্রতি 'ফুরকান' দান করা হবে ---কথাটির মর্ম অধিকাংশ মুফাসসির মনীষীর মত এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-সহায়তা থাকে এবং তিনি তাদের হিফাযত করেন। কোন শত্রু তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। যাবতীয় উদ্দেশ্যে তারা সাফল্য লাভে সমর্থ হন।

هر كه ترسيد از حق و تقوى گزيد
ترسد ازوے جن و انس و هر كه ديد

তফসীরে-মুহায়েমী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী ঘটনায় হযরত আবূ লুবাবা (রা) কর্তৃক স্বীয় পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে যে পদস্খলন ঘটে গিয়েছিল, তা এ কারণেও একটি ত্রুটি ছিল যে, পরিবার-পরিজনের হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি যথাযথ আনুগত্য অবলম্বন করাই ছিল সঠিক পন্থা। তা হলেই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সবই আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযতে চলে আসত। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন যে, এ আয়াতে ফুরকান বলতে সেসব জ্ঞান-বুদ্ধিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটি-মেকীর মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। অতএব, মর্ম দাঁড়ায় এই যে, যারা 'তাকওয়া' অবলম্বন করেন, আল্লাহ্ তাদেরকে এমন জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন যাতে তাদের পক্ষে ভাল-মন্দের পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, তাকওয়ার বিনিময়ে যা লাভ হয়, তা হল পাপের মোচন। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে মানুষের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় দুনিয়াতে সেগুলোর কাফ্ফারা ও বদলার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। অর্থাৎ এমন সৎকর্ম সম্পাদনের তৌফিক তার হয়, যা তার সমুদয় ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর প্রবল হয়ে পড়ে। তাকওয়ার প্রতিদানে তৃতীয় যে জিনিসটি লাভ হয়, তা হল আখিরাতের মুক্তি ও যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। এতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, আমলের যে প্রতিদান তা তো আমলের পরিমাণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। এখানেও তাকওয়ার প্রতিদানে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা তারই বদলা বা প্রতিদান। কিন্তু আল্লাহ্ হচ্ছেন বিরাট অনুগ্রহ ও ইহসানের অধিকারী। তাঁর দান ও দয়া কোন পরিমাপের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় এবং তাঁর দান ও ইহসানের অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তিনটি নির্ধারিত প্রতিদান ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আরও বহু দান ও অনুগ্রহ লাভের আশা রাখা কর্তব্য।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ এক অনুগ্রহ ও দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা রসূলে মকবুল (সা), সাহাবায়ে কিরাম তথা সমগ্র বিশ্বের উপরই হয়েছে। তা হল এই যে, হিজরত-পূর্বকালে মহানবী (সা) যখন কাফিরদের দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন এবং তারা তাঁকে হত্যা কিংবা বন্দী করার ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করছিল, তখন

আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন তাদের এ অপবিত্র হীন চক্রান্তকে ধূলিসাৎ করে দেন এবং মহানবী (সা)-কে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে দেন।

তফসীরে ইবনে কাসীর ও মাযহারীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ ও ইবনে জরীর (র) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে এই ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদীনা থেকে আগত আনসারদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কুরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তাঁর ব্যাপারটি মক্কার ভেতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদীনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন, তখন এঁদের একটি কেন্দ্র মদীনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এঁরা যেকোন রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলব্ধি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদীনায় গিয়েছেন, কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ (সা)-ও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে 'দারুন-নদ্ওয়াত'-এ এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। 'দারুন্-নদওয়া' ছিল মসজিদে-হারাম সংলগ্ন কুসাই ইবনে কিলাবের বাড়ি। বিশেষ জটিল বিষয় ও সমস্যাদির ব্যাপারে সলা-পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়িটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইসলামী আমলে এটিকে মসজিদে-হারামের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমান 'বাবুয-যিয়াদাতই' সে স্থান' যাকে তৎকালে 'দারুন-নদওয়া' বলা হতো।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কুরাইশ নেতৃবর্গ দারুন-নদওয়াতেই সমবেত হয়েছিলেন, যাতে আবূ জাহ্ল, নযর ইবনে হারেস, উমাইয়া ইবনে খালফ, আবূ সুফিয়ান প্রমুখসহ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মুকাবিলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়।

পরামর্শ সভা আরম্ভ হতে যাচ্ছিল। এমন সময় ইবলীসে লাঈন এক বর্ষীয়ান আরব শেখের রূপ ধরে 'দারুন-নদওয়া'র দরজায় এসে দাঁড়াল। উপস্থিত লোকেরা জানতে চাইল যে, তুমি কে এবং এখানে কেন এসেছ। সে জানাল, আমি নজদের অধিবাসী। আমি জানতে পেরেছি, আপনারা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পরামর্শ করছেন। কাজেই প্রবল সহানুভূতির কারণে আমিও এসে উপস্থিত হয়েছি। হয়তো এ ব্যাপারে আমিও কোন উপকারী পরামর্শ দিতে পারব।

একথা শোনার পর তাকেও ভেতরে ডেকে নেয়া হয়। তারপর যখন পরামর্শ আরম্ভ হয়---সুহায়লীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী---তখন আবুল বুখতারী ইবনে হিশাম এই প্রস্তাব উত্থাপন করে যে, তাঁকে অর্থাৎ মহানবী (সা)-কে লোহার শিকলে বেঁধে কোন ঘরে বন্দী করে এমনভাবে তার দরজা বন্ধ করে দেয়া হোক, যাতে তিনি (নাউযুবিল্লাহ্)

নিজে নিজেই মৃত্যুবরণ করেন। একথা শুনে নজদী শেখ ইবলীসে লাঈন বলল, এ মত যথার্থ নয়। কারণ, তোমরা যদি এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ কর, তবে বিষয়টি গোপন থাকবে না; দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে। আর তাঁর সাহাবী ও সঙ্গী-সাথীদের আত্মনিবেদনমূলক কীর্তি সম্পর্কে তো তোমরা সবাই অবগত। হয়তোবা তারা সবাই সমবেত হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণই করে বসবে এবং তাদের বন্দীকে মুক্ত করে নেবে। চারদিক থেকে সমর্থনের আওয়ায উঠল, নজদী শেখ যথার্থ বলেছেন। তার-পর আবূ আসওয়াদ মত প্রকাশ করল যে, তাঁকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হোক। তিনি বাইরে গিয়ে যা খুশী তাই করুন। তাতে আমাদের শহর তার ফিতনা-হাঙ্গামা থেকে বেঁচে থাকবে এবং আমাদেরকে যুদ্ধ-বিগ্রহেরও ঝুঁকি নিতে হবে না।

এ কথা শুনে নজদী শেখ আবার বলল, এ মতটিও সঠিক নয়। তিনি যে কেমন মিষ্টভাষী তোমরা কি সে কথা জান না? মানুষ তাঁর কথা শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। তাঁকে এভাবে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হলে অতিশীঘ্রই তিনি এক শক্তিশালী দল সংগঠিত করে ফেলবেন এবং আক্রমণ চালিয়ে তোমাদেরকে পর্যুদস্ত করে ফেলবেন। এবার আবূ জাহ্ল বলল, করার যে কাজ তোমাদের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারনি। একটি কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তা হল এই যে, আমরা সমস্ত আরব গোত্র থেকে একেক জন যুবককে বেছে নেব এবং তাদেরকে একটি করে উত্তম ও কার্যকর তলোয়ার দিয়ে দেব। আর সবাই মিলে সমবেত হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এভাবে আমরা তাঁর ফিতনা-হামলা থেকে প্রথমে অব্যাহতি লাভ করি। তারপর থাকল তাঁর গোত্র বনূ আবদে মানাফ-এর দাবি-দাওয়া, যা তারা তাঁর হত্যার কারণে আমাদের উপর আরোপ করবে। বস্তুত এককভাবে যখন তাঁকে কেউ হত্যা করেনি; বরং সব গোত্রের একেক জন মিলে করেছে, তখন কিসাস অর্থাৎ জানের বদলা জান নেয়ার দাবি তো থাকতেই পারে না। শুধু থাকবে হত্যার বিনিময়ের দাবি। তখন তা আমরা সব কবীলা বা গোত্র থেকে জমা করে নিয়ে তাদেরকে দিয়ে দেব এবং নিশ্চিন্ত হয়ে যাব।

নজদী শেখ তথা ইবলীসে-লাঈন একথা শুনে বলল, ব্যাস, এটাই হল শত কথার এক কথা, মতের মত মত। আর এছাড়া অন্য কোন কিছুই কার্যকর হতে পারে না। অতপর গোটা বৈঠক এ মতের পক্ষেই সমর্থন দান করে এবং আজকের রাতের ভেতরেই নিজেদের ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দৃঢ়সংকল্প করে নেয়।

কিন্তু নবী-রসূলদের গায়েবী শক্তি সম্পর্কে এই মূর্খের দল কেমন করে জানবে! সেদিকে হযরত জিবরাঈল (আ) তাদের পরামর্শ কক্ষের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে রসূলে করীম (সা)-কে অবহিত করে এই ব্যবস্থা বাতলে দেন যে, আজকের রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন করবেন না। সেই সাথে এ কথাও জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করারও অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কুরাইশী নওজওয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই সরওয়ারে দু'আলম (সা)-এর বাড়ীটি অবরোধ করে ফেলে। রসূলে করীম (সা) বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন এবং সাথে সাথে এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাণের ভয় থাকলেও শত্রুরা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত আলী (রা) এ কাজের জন্য নিজেকে পেশ করলেন এবং মহানবী (সা)-র বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে, হুযূর (সা) এই অবরোধ ভেদ করে বেরোবেন কেমন করে! বস্তুত স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এক মু'জিযার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। তা হল এই যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে মহানবী (সা) একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তাঁর ব্যাপারে যে আলাপ-আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি; অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার পর কোন এক আগন্তুক এসে অবরোধকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? তারা জানাল, মুহাম্মদ (সা)-এর অপেক্ষায়। আগন্তুক বলল, কোন্ স্বপ্নে পড়ে রয়েছ; তিনি এখান থেকে বেরিয়ে চলেও গিয়েছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি দিয়ে গিয়েছেন! তখন তারা সবাই নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ পেল। সবার মাথায় মাটি পড়েছিল।

হযরত আলী (রা) মহানবী (সা)-র বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তাঁর পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, তিনি মুহাম্মদ (সা) নন। কাজেই তাঁকে তারা হত্যা করতে উদ্যোগী হল না। ভোর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার পর এরা লজ্জিত-অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল। এই রাত এবং এতে রসূলে করীম (সা)-এর জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন করার বিষয়টি হযরত আলী (রা)-র বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

কুরাইশী সর্দারদের পরামর্শে মহানবী (সা) সম্পর্কে যে তিনটি মত উপস্থাপিত হয়েছিল, সে সবকটিই কোরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ অর্থাৎ সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে দেবে।